বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত

নজরুল স্মৃতিমাল্য

মনোহর সাহিত্য মন্দির । ৩৩ কলেজ রো । কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ। ১৩৬০

শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত।

প্রকাশক
শ্রীমণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীসরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২, বিনোদ সাহা লেন,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

কবি-বন্ধু

জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

সম্পাদকের কথা

কবি নজরুল সম্পর্কিত স্মৃতিচারণ
তাঁর সাহিত্য ও জীবন বিষয়ক সতেরোটি
রচনার সংকলন-গ্রন্থ এই
নজরুল-স্মৃতিমাল্য।
কবি নজরুলকে যাঁরা কাছে থেকে দেখেছেন,
বিশেষ করে তাঁদের লেখাই
এই সংকলন-গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে।
সুতরাং সেদিক দিয়ে
এই সামান্য ক'টি রচনার সংগ্রহ-গ্রন্থটির
একটি অন্য তাৎপর্য আছে।
ইতিপূর্বে 'নজরুল-স্মৃতি' নামে কবি নজরুল
সম্পর্কিত একটি সংকলন-গ্রন্থ
আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ও
সমাদর লাভ করেছে। 'নজরুল-স্মৃতিমাল্য'ও
যদি সেরূপ সমাদর লাভ করে আনন্দিত হবো।

যাঁদের লেখা আছে

সখি বলো বঁধুয়ারে নিরজনে—
দেখা হলে রাতে ফুলবনে ॥
কে করে ফুল চুরি জানে ফুলমালি—
কে দেয় গভীর রাতে ফুলের কুলে কালি—
জানে ফুলমালি গোপনে ॥

কাঁটারি আড়ালে গোলাপেরি বাগে
ফুটায়েছে কুসুম কত সোহাগে
সে কুসুম ঘেরা মেহেদির বেড়া
প্রহরী তোমরা সে কাননে ॥

পথেতে চোরকাঁটা সখি তায় বলে দিও
বেঁধে না বেঁধে না লো যেন তার উত্তরীয়।
এ কাননে নাহি না আসে কাঁটা দলি।
আপনি যাব আমি বঁধুয়ার কুঞ্জগলি ;
বিকাব বিনিমূলে ও চরণে ॥

নজরুল ইসলাম

নজরুলের ভক্তিসঙ্গীত

দিলীপকুমার রায়

আমার মনে হয় কাজীর প্রতিভার পরম পরিণতির পর্বে সে যেসব মধুর ভক্তির গান বেঁধেছিল তাদের আদর হয়নি আজো। কাজী নিজে আজ এ গানগুলি তার চমৎকার আবেগময় সুরে গাইলে আজ অনেকেই হয়ত বুঝবার কিনারায় আসতেন যে, কাজীর মধ্যে ভাগবতী করুণার অবতরণ হয়েছিল বলেই সে শতাধিক ভক্তির গান না বেঁধে পারে নি। এদের মধ্যে অনেকগুলি গানেরই ভাব ভাষা ছন্দ অতি মর্মস্পর্শী। দু-একটা উদাহরণ না দিলেই নয়। তার একটি গান আছে ঃ

তুই পাষাণগিরির মেয়ে হলি পাষাণ ভালোবাসিস ব'লে।
মা, গলবে কি তোর পাষাণ হৃদয় তপ্ত আমার নয়নজলে ?

আন্তরিকতায় মন ভিজে ওঠে শুধু পড়লেই, না জানি সুরে শুনলে আরো কত সহজে মন গলত! এর পরেই একটি শ্লোকের বাঁধুনি কী যে মধুর!—

কোটিভক্ত যোগী ঋষি ঠাঁই পেল না তোর চরণে
তাই ব্যথায়-রাঙা তাদের হৃদয় জবা হ'য়ে ফোটে বনে।

কিন্তু শুধু মধুর গানই তো নয়, কাজী ছিল শক্তিমান্ পুরুষ—তন্ত্রের পরিভাষায়, স্বভাবশাক্ত, তাই তো পারল এমন বলিষ্ঠ চরণের সঙ্গে কোমল ভাবের জোড় মেলাতে ঃ

তোর শক্তিপ্রসাদ পেয়ে মানুষ হবে অমর সেনা।
দিব্য জ্যোতির দেহ পাবে, দানব অসুর ভয় রবে না।
এই পৃথিবী ব্যথাহত শ্বেত শতদলের ম'ত
পুষ্পাঞ্জলি হ'য়ে মা তোর উঠবে ফুটে সেই সাগরে,
ভাগীরথী ধারার মত সুধায় সাগর পড়ুক ঝ'রে।

ইংরাজী ভাষায় কাব্যের শিখর গানের শিখরের চেয়ে উঁচু। ওদের শ্রেষ্ঠ বাণী মেলে কাব্যে—বিশেষ ক'রে অমিত্রাক্ষরে। কিন্তু ভারতে—আরো বেশি করে বাংলাদেশে—কাব্যের শিখর-মহিমা দীপ্ত হ'য়ে ওঠে গানেই বলব। এ আমার কথা নয়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা। আমার পিতৃদেবের মুখেও শুনতাম এই কথাই। একদিন বলেছিলেন তিনি : "ওরে পরে বুঝবি আমি কী সব গান রেখে গেলাম।" রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন -- তাঁর শ্রেষ্ঠ দান তাঁর গান। মহাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ একথায় পুরোপুরি সায় দিতেন।

এ সম্বন্ধে আমি আমার "স্মৃতিচারণ"-এ লিখেছি যে, বাঙালী কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি চিরদিনই ফুটে উঠেছে তার গানে। বাংলাদেশের মাটি গানের অশ্রান্ত জোয়ারে আজও উর্বর। শুধু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, শশিশেখর, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ ভক্তগীতকারেরাই নন, শত শত আউল বাউল সারি ভাটিয়ালি কথকতা বর্গীয় ভক্তিসঙ্গীত আমাদের মনের আকাশে বাতাসে নিরন্তর চলাফেরা ক'রে আসছে যার ফলে একটু ঊর্ধ্বদৃষ্টি হ'তে না হ'তে আকাশের সত্যও আমাদের মনের কানে কানে কথা কয়, আর অমনি শ্রেষ্ঠ বাঙালী ভক্ত-কবির মন গান গেয়ে ওঠে (দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়) :

এখন বড় শান্ত আমি ওমা কোলে টেনে নেনা
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো।

কাজীর ছিল এই শ্রেণীর শিশু সরল মন—স্বভাবপ্রবুদ্ধ কবিপ্রাণ, সহজ বিশ্বাসী অন্তর ও সর্বোপরি অসামান্য প্রতিভা ; যার আবাহনে দিগন্তে অসীমের শুভ্রালোকের সঙ্গে মর্ত্যের অসীম আঁধারের মিলনবাণী তার মনে জন্ম নিত, অনন্যতন্ত্র ছন্দ-ভাষার কল্পলোকে। একথার একটি পরম পরিচয় আমি সে-যুগেই পেয়েছিলাম যখন সে ধর্মের দিকে পা বাড়ালেও সীমান্ত পেরোয় নি। লিখেছিল একটি অপরূপ সপ্তমাত্রিক শিবস্তোত্র, বসিয়েছিল, মালকোশ ধামারে। এ-গানটি আমার ও

অতুলপ্রসাদের একটি বিশেষ প্রিয় গান ছিল, আমি গাইতাম প্রায়ই তাঁর কাছে। শিবের এমন উদাত্তঝঙ্কার স্তোত্র এ যুগে সত্যিই বিরল :

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু।
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভূ।
সে-নাচহিল্লোলে জটা-আবর্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন প্রাঙ্গণে,
আ·াশে শূল হানি' শুনাও নববাণী,
তরাসে কাঁপে প্রাণী প্রসীদ শম্ভু!
ললাট শশী টলি, জটায় পড়ে ঢলি',
সে শশী চমকে গো, বিজলি ওঠে ঝলি',
কাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,
মুরছে ভয়ভীতা নিশি নিরঞ্জনা,
আঁধারে পথহারা চাতকা কেঁদে সারা,
যাচিছে বারিধারা ধরা নিরম্বু।

মিল ছন্দ উপমা সব জড়িয়ে কী অপূর্ব ছবিই না ফুটে উঠেছে এ-জমকালো গানটিতে!—পাখোয়াজে ধামার গাইতে গাইতে শুধু যে আমিই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম তাই নয়, শ্রোতাদেরও মন সম্ভ্রমে ভ'রে উঠত যার ইংরাজী নাম awe। এমন শক্তিস্পন্দিত গান বাংলাভাষায় বিরল। তাই আরো দুঃখ হয় ভাবতে যে কাজী তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের মধ্যাহ্ন লগ্নেই নীরব হ'ল কর্মফলে—যার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া দুরূহ। সাধনার পথে সাধকের বিশেষ সাবধান হ'তে হয়। কিন্তু সে অন্য কথা।

এর পরেই তার জীবনের মোড় ফিরল ভক্তি-সাধনার দিকে। ফলে একের পর এক কত গানই না সে বাঁধল। আমি ঠিক এই সময়েই পণ্ডিচেরী প্রস্থান ক'রি বলে কাজীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আর হয় নি। পণ্ডিচেরী থেকে এসে একবার মাত্র তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বড়

শোকাবহ পরিবেশে। তার বর্ণনা নিষ্ফল—তাই যাতে লাভ আছে তাতেই মন দিই, বলি কাজীর ভক্তিসঙ্গীতের কথা। তার সব গান রসোত্তীর্ণ না হলেও বহু গানই উদ্ধৃতিযোগ্য, স্থানাভাবে মাত্র কয়েকটি কথা বলব। কিন্তু একটু ভূমিকা আছে।

মানুষের মনে যখন প্রথম বৈরাগ্যের সুর ভেসে আসে, তখন সংসারের খেলা মনে হয় মায়ার খেলা। পরে সে দেখে যে, মায়া নয় কিছুই, কিন্তু মায়াকে পেরুতে হ'লে নেতি-নেতির পথ নিতে হয় অনেক সময়েই। দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও এ-সুর বেজেছিল তাঁর অনেক গানেই: শুধু দু'দিনের খেলা, আমার আমার ব'লে ডাকি, জীবনটা তো দেখা পেল শুধুই কেবল কোলাহল ইত্যাদি। কাজীর গানের মঞ্জুসা ঢুঁড়লে এ-শ্রেণীর উদাসী গান নিশ্চয় মিলবে একের পর এক। আমি শুধু দুটি উদ্ধৃত করি (বুলবুল):

এ-কুল ভাঙে ও-কুল গড়ে, এই তো নদীর খেলা
(রে ভাই) এইতো বিধির খেলা।
সকালবেলা আমীর রে ভাই, ফকীর সন্ধ্যাবেলা॥
(সেই) নদীর ধারে কোন্ ভরসায়
(ওরে বেভুল) বাঁধলি বাসা সুখের আশায়
(যখন) ধরল ভাঙন পেলিনে তুই পারে যাবার ভেলা॥
(এই) দেহ ভেঙে হয় রে মাটি, মাটিতে হয় দেহ,
(যে) কুমোর গড়ে সেই দেহ—তার খোঁজ নিল না কেহ।
(রাতে) রাজা সাজে নাটমহলে
(দিনে) ভিক্ষা মেগে পথে চলে
(শেষে) শ্মশানঘাটে নিয়ে দেখে—সবই মাটির ঢেলা।
এই তো বিধির খেলা রে ভাই, ভবনদীর খেলা॥

সংস্কৃতে বলে: "চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনম্।" সংসারের সব কিছুই চঞ্চল ক্ষণিক—"নলিনীদলগত জলমতিতরলম্—তদ্বজ্জীবন-মতিশয়চপলম্—পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মতন মানুষের জীবন যেখানে

টলমল করছে, কখন ঝ'রে যাবে পাপড়ির সঙ্গে, কেউ কি জানে? সব কিছুই অস্থায়ী সেখানে। মানুষের মন ব্যথিয়ে ওঠে, বলে—ক্ষণিকের হাটে কিসের বেসাতি করব;—আমি যে চাই চিরদিনের সঙ্গে লেনদেন—

আমার বলবার উদ্দেশ্য—এ-মায়াবাদ শুধু আমাদের দেশেরই জীবনবেদ নয়, দেশে দেশে কালে কালে বহু শ্রেষ্ঠ মনই এ-গান গেয়েছে নানা সুরে নানা তালে, আর তাতে বহু বিকশিত মন সাড়া দিয়েছে এই জন্যেই যে, ভগবানকে না পেলে সত্যিই মনে হয়—"জীবন বিফল মেলা"—Vanity vanity all is vanity! তাই ভগবানের মোহানার দিকে তীর্থযাত্রা শুরু হয় সব দেশেই এই মূল বৈরাগ্যের তাগিদে যে, এ-জীবনকে একান্ত ক'রে ধ'রে রাখতে চাইলে সে ফস্কে যায় ব'লে জীবনের ওপারে কোনো শাশ্বত বস্তুকে পেতেই হবে যে ক'রে হোক। এমন কি বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তিবাদকে যিনি নামঞ্জুর করেছিলেন মনের এক বলিষ্ঠ মুড-এ তিনিই আর এক উদাস মুড-এ লিখেছেন:

এই কথাটা ধ'রে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে
যে-পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে।

অথবা

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই না তোমারে।

অতুলপ্রসাদের নানা গানেও এ উদাস সুর বেজে উঠেছে (গীতিগুঞ্জ):

ওগো সাথী, চিরসাথী! আমি সেই পথে যাব সাথে।
যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়
যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়
সে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির-রাতে।

রজনীকান্তের নানা গানে এ বৈরাগ্যের সুর আরো পরিস্ফুট:

কবে তৃষিত এ-মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে?
কবে তাপিত এ চিত্ত হইবে শীতল তোমার করুণা-চন্দনে?

রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্য-বিমুখ সুরে যারা বলীয়ান্ হ'য়ে এ-উদাস সুরকে নকল করতে চান তাঁদের তিনি শুধু তাঁর নানা অলৌকিক গানেই নয় নানা উদাস মিসটিক কবিতায়ও নির্ভরসা ক'রে দিয়েছেন এই বৈরাগ্যকেই বরণ ক'রে। যথা ঃ

বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে
হেথা নয়, হেথা নয় আর কোনোখানে।

কাজেই যারা বড় গলা ক'বে বলেন—কবিগুরুর জীবন দর্শনে শুধু একটি মাত্র ঐহিকতার পৃথ্বীবিলাসের সুর বেজেছে, তাঁরা ভুল বলেন। সব দেশেই জীবনের চঞ্চলতা, মানুষের নানা হীনতা, নীচতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, পথচলায় কাঁটাবন, নিয়তির অবিচার, শক্তির অত্যাচাব, হাত বাড়িয়ে না-পাওয়ার বেদনা, কূলে এসে তরী ডোবার কারুণ্যের দৃশ্য আবহমানকাল আমাদের মনের এই চিরন্তন চাপা কান্নাকে ফুটিয়ে তুলেছে যে, জীবন কথা দিয়ে কথা রাখে না, "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই" যা পেয়েছি তা'তে মন ভরে না, এমন কি পেলে দেখি যে, সবই ছায়াবাজি, তাই প্রাণের চিরন্তন কান্না ঃ

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে।

কাজীর কবি-মন বিকশিত মনের কোঠায় পড়ে। তাই তো তার জীবনে যশের দীপ্ত শিখর-মুহূর্তেও এই ছায়ার সুর বার বারই বেজে উঠত যে, জীবনেও সব কিছু পেলেও মন হাত্‌ড়ে বেড়ায়, এমন কিছু পেতে যা না পেলে সব পাওয়াই ব্যর্থ মনে হয়, মানুষকে হাজার ভালোবাসলেও তার 'পরে পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না, তাই হে পরম অচিন-চেনা বন্ধু। তুমি এসো, না এলে মিটবে না আমার পিপাসা, সংসারের নিটোল সমৃদ্ধির মাঝেও মনে হবে নিজেকে নিঃস্ব, যাই কেন না রচি, বহু যত্নে হ'য়ে উঠবে তাসের ঘর, নীড় হ'য়ে উঠবে কারাগার। তাই গাইল সে যশের জয়াভিযানের আলোকলগ্নেই (গীতি শতদল) ঃ

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু, আর তো হব না পথহারা।
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়, তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা।...
ভ্রান্ত পথের শ্রান্ত পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে।
আরো যাহা কিছু আছে মোর প্রিয়, ল'য়ে বাঁচাও এ-বন্দীরে।
কী হবে ল'য়ে এ-মায়ার খেলনা, কী হবে ল'য়ে এ-তাসের ঘর ?
ছুঁতে ভেঙে যায়, তবু শিশুপ্রায় ভুলাও মোদেরে নিরন্তর।

তাই গাইলে কাজী আকুল কণ্ঠে ঃ

ডাকি' লও মোরে মুক্ত আলোকে
তব আনন্দ নন্দন লোকে
শান্ত হোক এ ক্রন্দন, আর সহে না এ-বন্ধন কারা
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়, তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা।

কিন্তু সাধারণতঃ, যারা অল্পের বেসাতি ক'রেই তৃপ্ত থাকে তাদের কানে "নাল্পে সুখমস্তি"র শঙ্খধ্বনিও বাজে না, বৃন্দাবনের আকুলবাঁশির আয় আয় ডাকও তাদের কুল ছাড়ায় না। এখানে আসে ভগবানের কৃপার কথা ঃ যাকে তিনি বরণ করেন সেই তাঁর শরণ-পায়। এ-কথা উপনিষদে বলেছে সে কবে ঃ "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" অন্যভাবে বললে বলা যায়, যাদের মন বেশি বিকশিত (evolved) তারাই ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের অভিসারে উধাও হ'তে চায়। আর এ-উধাও হবার প্রথম পদক্ষেপ হয় বৈরাগ্যেরই টানে। তাই "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়" এ-কথা রবীন্দ্রনাথের মুখে মানালেও বিধু সিধু যদু মধুর মুখে মানায় না, যারা পুঁজি আঁকড়ে থাকতে চায় ভয়ে ভয়ে—তাদের রবীন্দ্রনাথও কিছু কম ধমকান নি ঃ

সুখের আশা আঁকড়ে ল'য়ে থাকিসনে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভ'রে নিতে মরণ আঘাত পেতেই হবে,
পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি ছুটি তোরে পেতেই হবে।

কাজীর মন এ-জাতের নয়, ভয়ে ভয়ে কোন কিছু আঁকড়ে থাকার পাত্র সে নয়, সে এ-পারে আদৌ তৃপ্তিই পায় নি যে, কেমন ক'রে

বলবে—আমি যা পেয়েছি তাই নিয়ে ঘর করব? তাই তার ভক্তপ্রাণ কেঁদে উঠল (গীতি শতদল):

কেমন তব রূপ দেখি নি হরি,
আপন মন দিয়ে তোমারে গড়ি,
হাসো না কাঁদো তুমি সে রূপ হেরি'
বুঝিতে পারি না—তাই কাঁদে প্রাণ।

এ "কথামালা গেঁথে করতালি পাওয়া"র আশা নয়, এরই নাম খাঁটি দুরাশা, অভীপ্সা—aspiration: আমি তোমাকে যে রূপে কল্পনা করছি তা'তে তুমি খুশী তো? না হ'লে আমি কী করব প্রভু! কেমন ক'রে তোমার পূজা করব? তুমি প্রসন্ন না হ'লে যে আমার গতি নেই।—

তোমারে কী দিয়ে পুজি ভগবান!
বুঝিতে পারি না তাই কাঁদে প্রাণ।

সাধনার পথ যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে এমনি অভিজ্ঞতা প্রায়ই হয় (যদিও সব সময়ে নয়) যে, তাঁরা কোনো কবিতা বা গানের মধ্যে লেখকের অন্তর উপলব্ধির স্পন্দন গভীরভাবে অনুভব করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের নানা ভক্তির গানেই এই স্পন্দন স্পষ্ট। কিন্তু তার পরেই যেসব কবির নামডাক হয়েছে তাঁদের সবাই চলেছেন দেখা যায় "শিল্প শিল্পের জন্যে" (art for art's sake)-এর মন্ত্র জপ ক'রে—তথাকথিত সুন্দরের অভিসারে। কিন্তু শুধু সৌন্দর্যের পানে এ-অভিসারে শিব সত্যের সঙ্গে যোগ না হ'লে মানুষ কৃতার্থ হ'তে পারে না, অন্নের পসারীই থেকে যায়। তাই এ জাতীয় সৌন্দর্য-সর্বস্বতা তাঁদের মন টানে না, যাঁরা কবিতায় (বা বিশেষ ক'রে গানে) খোঁজেন অন্তরাত্মার অসীমতৃষ্ণার কোনো অভিব্যক্তি। অবশ্য এই শ্রেণীর সন্ধানী কম সব দেশেই। তাই কবিতায় বা গানে ভক্তির বা সুদুরাশার কোনো পরিচয় না পেলে খুব কম লোকই মনে করেন কোনো বড় অভাব রয়ে গেল। কিন্তু যাঁরা ভালোবাসেন গানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, অর্থাৎ ভক্তি-

সঙ্গীত, তাঁরা কেমন ক'রে এই ভাবের দৈন্যকে বরণ করবেন পরম শিল্প ব'লে? তাঁরা চাইবেনই চাইবেন গানে অন্তরাত্মার এই পরম আকুতি যা যে-চারজন কবির নাম করলাম তাঁদের পরে পাই কেবল কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কাজী ও কবি নিশিকান্তের গানে। নিশিকান্তের তেমন নামডাক হয় নি, কারণ তিনি ভক্তি ছাড়া আর কোনো রসের প রবেশন করেন না বললেই হয়। তাঁর জীবনদর্শন হ'ল (অলকানন্দ):

কবিরে তোমার কহিতে শিখাও গভীর কথা
দূর করো তার গভীর প্রবাহে প্রমত্ততা।··
কী হবে ভাসায়ে অকারণে শাদা মেঘের ভেলা?
কী হবে আকাশকুসুমের রঙে রাঙায়ে বেলা?
যে কুসুম ফুটে ওঠে আঙিনায়
তাই দিয়ে যেন অর্ঘ্য সাজায়
তার প্রতিদলে পরশিয়া দাও তন্ময়তা।

কবিরে তোমার গাহিতে শিখাও গভীর কথা। এর ভাষ্য করা যেতে পারে এই ব'লে:

আমার সকল খোঁজার যখন হ'ল শেষ,
তোমার অপার আভাষ পেলাম যে এ-পারে,
চেয়ে তোমার আলোর পানে নির্ণিমেষ
আলো এ-সংসারের ডুবল অন্ধকারে।
আর রইল না তো দ্বন্দ্ব সে-লগনে
যখন উঠল তোমার প্রেম কুসুমি' মনে,
আমার অন্তর গান উঠল গেয়ে—যখন
দিলে রাঙা পায়ে ঠাঁই তুমি আমারে;
আমার যা কিছু সব লুটে যখন নিলে,
এ-প্রাণ শুনল শুধু তোমার অভিসারে।

কাজীরও জীবনে এল এই পরম বিকাশ, গভীর কথা গভীর সুরে

বন্যার পরম অভিসারের লগ্ন। তখন রইল না আর বিষাদ ব্যথা, বিরহের আবাহনে মিলনীর আভাষ মিলল—হোক না ক্ষণে ক্ষণে, কিন্তু মিলল তো, জানিয়ে দিলেন তো তিনি—কাজীর ভাষায়।

(গীতি শতদল) :

সখি যায় নি তো শ্যাম মথুরায়—
সে যে রয়েছে তেমনি ঘিরে আমায়
মোর অন্তরতম আছে অন্তরে,
অন্তরালে সে যাবে কোথায় ?
মোর ধেয়ানে স্বপনে, জাগরণে মোর
নয়নের জলে আঁখি-তারায়।

সাধন-জীবনে বিরহ আসে বারবারই, মিলনের আভাষ পাওয়ার ঠিক পরেই। এই আভাষ পাওয়ার লগ্ন মনকে মাধুর্যে জারিয়ে তোলে। কিন্তু এ মাধুর্যের প্রকাশ মর্মস্পর্শী হয় কেবল তখন যখন সাধক হয় প্রতিভাধর কবি—যেমন কাজী। এই ধন্যলগ্নে কাজী কয়েকটি যে অপরূপ গান বেঁধে গেছে—যদি আজ সে কণ্ঠ নীরব না হ'ত তা' হ'লে সে এমন গান আরো কতই না বাঁধত। কিন্তু যা পাইনি তার খেদ রেখে তার কাছে যা পেয়েছি তারই খবর দেওয়া ভালো—কেন তার কবিকণ্ঠ নীরব হ'ল সে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি ?

কাজী এই প্রাপ্তির লগ্নে বেঁধেছিল একটি অপূর্ব গান :

বল্‌রে জবা বল :
কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণ তল ?
মায়া তরুর বাঁধন টুটে মায়ের পায়ে পড়্‌লি লুটে,
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ-বিহ্বল।
তোর সাধনা আমায় শেখা, জীবন হোক সফল।
কোটি গন্ধকুসুম ফোটে বনে মনোলোভা,
কেমনে মা-র চরণ পেলি তুই তামসিক জবা ?

তোর ম'ত মা-র পায়ে রাতুল হব কবে প্রসাদী ফুল
কবে তোরই ম'ত রাঙবে আমার মলিন চিত্তদল ?
তোর সাধনা আমায় শেখা, জীবন হোক সফল।

সব কিছুতেই কবি পেতে সুরু করেছেন মায়ের পায়ের পুলক পরশ—যার ফলে তার হৃদয়ে জেগে উঠেছে রঙিন হ'য়ে ওঠার পরম কামনা ? কী সুন্দর তথা সত্য উপলব্ধি !

কিন্তু বলেছি, এই উচ্ছল আনন্দের আভাষ স্থায়ী হয় না যত দিন না আমাদের প্রকৃতি দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। তাই আসে বিরহ। এরি তো নাম চির-পলাতকের সঙ্গে চির-সন্ধানীর লুকোচুরি খেলা। তবু একবার আভাষ পাওয়ার পরে যে-বিরহ আসে তারও রূপান্তর হয়। কারণ এ-মিলনের আভাষ পেলেও দুনিয়ার চেহারা বদ্‌লে যায়, ফলে বেদনা ব্যথা দিলেও আর নিরাশা আনে না। কেন না তখন যে অন্তর হ'য়ে ওঠে একান্ত। বিরহিণী লোভী হিয়া তখন আর কিছুই চায় না, শুধু তার এক ধ্যান এক জ্ঞান—গায় সে শুধু—দেখা দাও, তার জন্যে কলঙ্ক হয় হোক, সব ছাড়তে হয় ছাড়তে আমি রাজী—কাজীর ভাষায় (গীত শতদল) ঃ

বাজিয়ে বাঁশি মনের বনে এসো কিশোর বংশীধারী !
চূড়ায় বেঁধে ময়ুরপাখা, বামে ল'য়ে রাধা প্যারী।
আমার আঁধার প্রাণের মাঝে
এসো অভিসারের সাজে,
নয়নজলের যমুনাতে উজান বেয়ে ছুটুক বারি।
এম্‌নি চোখে তোমায় আমি দেখতে যদি না পাই হরি,
দেখাও পদ্মপলাশ-আঁখি ! তোমার প্রেমে অন্ধ করি'।
ঘুচাও এবার মায়ার বেড়ী,
পরাও তিলক কলঙ্কেরি,
"শ্যাম রাখি কি কুল রাখি"—শ্যাম হে, আর সইতে নারি !

কাজীর সম্বন্ধে আরো কত কথাই বলার ছিল। কিন্তু একটি

নিবন্ধে অত ভার সইবে না। তাই তার ছন্দের কলি, সুরের বৈশিষ্ট্য, আনন্দের নানারঙ, রূপ, উপলব্ধির পথে ভক্তির অনন্যতন্ত্র গতি— আরো কত কী বলা হ'ল না। নাই হোক। আরো কত গুণী দরদী রসিক আছেন তাঁরা বলবেন কাজীর এসব কীর্তির কথা, অবশ্য ভক্তি বাদ, ও যে অচল!

আমি শুধু শেষে কাজীর প্রাণের একটি মূল ধুয়া উদ্ধৃত ক'রে শেষ করি—যার নাম আমি দিতে চাই শাস্ত্রের বাণী নয়—হৃদয়ের বাণী। কাজী ছিল না বুদ্ধিবাদী। তাব একমাত্র নিকষ ছিল হৃদয়। এখানে তার ভুল হয় নি। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও বলেছে যে, সত্য ও শ্রদ্ধার পীঠস্থান মগজ নয়—হৃদয়ঃ

হৃদয়ে হ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি
হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি

এই হৃদয়ের বাণী কাজী তার 'সত্যমন্ত্র' শীর্ষক দীর্ঘ গানটিতে তারই বিশিষ্ট ঢঙে ঘোষণা করেছে, যা পড়তে না পড়তে মন ভ'রে ওঠে —গানে শুনলে নিশ্চয় অভিভূত হ'য়ে পড়তে হ'তঃ

পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর, বিধির বিধান সত্য হোক।
(এই খোদার উপর খোদকারি তোর মানবে না আর সর্বলোক।)···
বিধির বিধান মানতে গিয়ে নিষেধ যদি দেয় আগল,
বিশ্ব যদি কয় পাগল —
বুক ঠুকে তুই সত্য বল্।
(তখন) তোর পথেরই মশাল হ'য়ে জ্বলবে বিধির রুদ্র রোষ।
জাতের চেয়ে মানুষ সত্য, অধিক সত্য প্রাণের টান
প্রাণের ঘরে সব সমান।
বিশ্বপিতার সিংহাসেন প্রাণবেদীতেই অধিষ্ঠান,
আত্মার আসন তাই তো প্রাণ।
জাত সমাজের নাই সেথা ঠাঁই জগন্নাথের সাম্যলোক,
জগন্নাথের তীর্থলোক,
বিধির বিধান সত্য হোক।

নজরুল ইসলাম

নলিনীকান্ত সরকার

তেরশ সাতাশ সালের অগ্রহায়ণ মাস। সান্ধ্যভ্রমণ সেরে আমাদের সেকালের 'বিজলী' অপিসের বাড়িতে ফিরে দেখি, জনকয়েক তরুণকে নিয়ে চিরতরুণ বারীন-দা (শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ) বেশ আড্ডা জমিয়েছেন। ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন "নজরুল ইসলামের কবিতা পড়েছো ?"

উত্তর দিলাম, "হাবিলদারেব মতোই কবিতা।"

সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম অট্টহাসির উত্তাল তরঙ্গ বেরিয়ে এল একটি তরুণের মুখের ভেতর থেকে। বারীন-দা সেই তরুণটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "ইনিই হাবিলদার কজী নজরুল ইসলাম।"

আমি একটু লজ্জিত হয়ে পড়লাম—মানুষটিকে আগে না জেনেশুনে ঐ অশোভন উক্তি প্রকাশ করবার জন্যে। কিন্তু আমি লজ্জিত হলে কি হয়,—নজরুল ইসলাম যেন তাতে আরো আনন্দমুখর হয়ে উঠলেন।

তখন নজরুলের দু-তিনখানি কবিতা বেরিয়েছে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায়। তাঁর তখনকার সব রচনাতেই রচয়িতার নামের জায়গায় লেখা থাকত, হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। কোনো কোনো গুণগ্রাহী ব্যক্তি তাঁকে 'সৈনিক-কবি' বিশেষণেও ভূষিত করতেন। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে হাবিলদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের পদমর্যদার মোহ তিনি বোধ হয় তখন কাটিয়ে উঠতে পারেন নি বলেই সাহিত্যক্ষেত্রেও নামের আগে হাবিলদার কথাটি জুড়ে দিতেন।

নজরুলের অভ্যুদয়ের যুগে যে-সব রচনায় তাঁর স্বকীয়তা ফুটে উঠেছিল, সেগুলির মধ্যে আমি প্রথম পড়ি 'শাতিল আরব' কবিতাটি। বোধ হয় ঐ শ্রেণীর কবিতার ঐটিই তাঁর সর্বপ্রথম রচনা।

সেই প্রথম দিনের নজরুল উদীয়মান কবি মাত্র। তাঁর প্রতিভার দীপ্তি তখনও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়নি। রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিতা-কুঞ্জের ভেতর তাঁর কবিতা কয়টি একটুখানি স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করেছিল মাত্র। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, এটা তখনও অনেকেই জানতে পারেনি। বাংলা পারসিক শব্দের যোজনায় যে অপূর্ব সুন্দর ছন্দঝঙ্কার তিনি তুলেছেন, তারই প্রতি রসিক-জনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এ নিয়ে উপহাসও করতো অনেকে। আমিও সেদিন উপহাস করেই বলেছিলান—"হাবিল্‌দারের মতোই কবিতা।"

নজরুল ইসলাম মানুষটিকে সেদিন খুবই ভালে লাগলো। প্রাণখোলা হাসি, মন-খোলা কথা, দিল-খোলা মানুষ। রোমন্থন করে চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলে কৃত্রিম সভ্যতা জাহির করবার হাস্যকর প্রয়াসের বালাই নেই, বরং তাঁর রসনার রস এমনই তরল ছিল যে, তথাকথিত সভ্যসমাজ তাতে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করতেন তাঁর সান্নিধ্যে এসে। আমি কিন্তু নজরুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম এই স্বচ্ছ, স্পষ্ট, নির্ভীক মানুষটির জন্যে।

সে সময়ে কলকাতায় সাহিত্যসেবীদের কয়েকটি আড্ডা ছিল, তার মধ্যে দুটি আড্ডা ছিল বেশ বড় রকমের। সুকিয়া স্ট্রীটে (বর্তমান কৈলাস বসু স্ট্রীট) কান্তিক প্রেসের তেতলায় ছিল 'ভারতীর আড্ডা' আর দ্বিতীয়টি ছিল ৩৮নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে 'গজেন-দা'র আড্ডা। ভারতীর আড্ডার সকাল-বেলার আড্ডাধারীরা অনেকেই, যথা—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, গিরিজাকুমার বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি সমবেত হতেন সন্ধ্যার সময় গজেনদার আড্ডায়।

গজেন্দ্র ঘোষ, ওরফে গজেন-দা ছিলেন সুরসিক ব্যক্তি। নজরুল সেই আড্ডায় এসে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতেন। তখন তাঁর স্বরচিত সঙ্গীত বেশি ছিল না। কেবল মাত্র একটি স্বরচিত গান তাঁর কণ্ঠে শোনা যেত—"পথিক ওগো চলতে পথে তোমার আমার পথের দেখা"।

কলকাতার স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর 'অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব' ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়ে যাবার বছরখানেক পরে তুমুল রাজনৈতিক আন্দোলনে আইন আদালত, স্কুল কলেজ, রাস্তা পার্ক, এমন কি অন্তঃপুর পর্যন্ত আলোড়িত—নজরুল ইসলামের নতুন নতুন কবিতা ও গান সাহিত্য ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রকেই উদ্দীপ্ত করে তুললো। এই সময় নজরুলের কবি প্রতিভা ছড়িয়ে পড়লো সারা বাংলায়। সকাল-বেলাকার নবোদিত সূর্য যেন অকস্মাৎ মধ্যগগনে ভাস্বর হয়ে উঠে সকলকে বিস্ময়-বিমোহিত করে তুললো।

নজরুল ইসলাম সুকণ্ঠ ছিলেন না। কিন্তু স্বরচিত সঙ্গীত তাঁর কণ্ঠে যেন রূপে রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতো। নজরুলের কণ্ঠে এমন একটি উপাদান ছিল, যাতে তিনি তাঁর গানের অন্তর্নিহিত ভাবকে মূর্ত করে এঁকে দিতেন শ্রোতাদের মানসপটে।

একটা কথা বলা প্রয়োজন। 'বিজলী' কার্যালয়ে নজরুলকে প্রথম দেখার পর থেকে এই কালের ব্যবধান খুব বেশি নয়,—হয়তো বা পাঁচ-ছ'মাস। কিন্তু জানি না নজরুলের অন্তরের মানুষটি কেমন করে এই অল্পকালের মধ্যে আমাকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে ফেললো।

নজরুল ইসলাম থাকতেন মেডিকেল কলেজের সম্মুখে ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে 'মোসলেম ভারত' কার্যালয়ের পাশের একটি ঘরে। এখনকার ভারত-প্রসিদ্ধ কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহমদ সাহেব ছিলেন তাঁর সহকক্ষবাসীদের অন্যতম।

নজরুলের প্রাত্যহিক গতিবিধি ও কার্যসূচীর সন্ধান আগে থেকেই আমার জানা থাকতো। একদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নজরুলের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ঠিক তার পরের দিন সকাল-বেলায় গিয়ে দেখি নজরুল ঘরে নেই। তাঁর একজন সহবাসী বন্ধু হাসতে হাসতে বললেন, "সে তো কাল রাত্তিরে কুমিল্লায় চলে গেছে।"

আমি বললাম, "কই, কাল তো কিছুই বললো না।"

"বলবে কি করে। কাল সন্ধ্যার পরে একজন ভদ্রলোক এসে কি-সব কথাবার্তা ক'য়ে কুমিল্লা যাবার প্রস্তাব করলেন; প্রস্তাব, অনুমোদন, সমর্থন সব এক মুহূর্তের মধ্যে—সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালদহ স্টেশনে যাত্রা।"

আমার চেয়ে এই সহবাসী বন্ধুরই চিন্তা হয়েছে বেশি। 'প্রবাসী' পত্রিকার যেমন রবীন্দ্রনাথ, 'মোসলেম ভারতের' তেমনি ছিলেন নজরুল ইসলাম। নজরুলের তখনকার লেখা প্রধানতঃ বেরুতো 'মোসলেন ভারত'-এ। নজরুলের এই সহবাসী বন্ধুটি 'মোসলেম ভারতের' কর্ণধার আফজল-উল-হক।

নজরুলের এই আকস্মিক অন্তর্ধানে আমি ক্ষণিকের জন্যে বিস্মিত হলেও, না-জানিয়ে যাবার ক্ষোভ আমাকে অভিভূত করেনি। কারণ আমি তাঁকে ভালো করেই চিনতাম। অন্তরঙ্গ ছিলাম বলেই যে আমি একাকী তাঁর হৃদয়ের পান্থশালাটি জুড়ে বসে আছি, এ ভ্রান্ত-বিশ্বাস আমার ছিল না।

বৈষ্ণব-কবি শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনা করেছেন—'সো বহুবল্লভ কান'' বলে। নজরুলকে সে-সময়ে সেইভাবে বিশেষিত করলে কিছুমাত্র সত্যের অপলাপ হতো না। তাঁর বলিষ্ঠ দেহ-মন, পৌরুষপূর্ণ রচনা ও প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের প্রতি স্বভাবতঃই অনেকে আকৃষ্ট হয়ে পড়তো। আচার্য শঙ্করের যেমন 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—নজরুলও তেমনি প্রেমতান্ত্রিক সাধনার এমন একটি স্তরে বাস করতেন, যেখান থেকে তাঁর মনে হতো যার কাছে আছি সে-ই সত্য, বাকী সব মিথ্যা, মায়া।

তাঁর চরিত্রের এই দিকটা জানা ছিল বলেই আমার কোন অভিমানের অভিযোগ ছিল না তাঁর ওপর।

কুমিল্লায় তো তিনি গেলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়—না চিঠি না পত্তর, না খোঁজ না খবর। লোকমুখে ভালোমন্দ সত্যমিথ্যা নানা গুজব রটতে লাগলো তাঁর সম্বন্ধে। সে সবের-সার সঙ্কলন ক'রে দাঁড়ালো এই যে, তিনি প্রথমতঃ গিয়েছিলেন কুমিল্লার একটি পল্লীগ্রামে। সেখান থেকে চলে এসে কুমিল্লা শহরে অবস্থান করছেন এবং সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগে শহরটিকে বেশ তাতিয়ে তুলেছেন।

মাস-ছয়েক কেটে যাবার পর নজরুল ফিরলেন কলকাতায়। ফিরে আবার এখানকার আসর জাঁকিয়ে তুললেন। এই সময় তাঁর ইচ্ছে হলো একখানি সাপ্তাহিক বের করবার। কাগজের নাম হলো 'ধূমকেতু'।

"আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নি-সেতু,
দু'দিনের এই দুর্গ-শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্-না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।"

—রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী শিরে ধারণ করে প্রতি সংখ্যা 'ধূমকেতু' যে অগ্নিবৃষ্টি করতে আরম্ভ করলো, তার একটি স্ফুলিঙ্গ নজরুলের 'আগমনী' কবিতার ভেতর থেকে বেরিয়ে সটান গিয়ে পড়লো লাল-বাজার পুলিশের আপিসে। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী-সান্ত্রীতে 'ধূমকেতু'র আপিস ভরে গেল। তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাশির পর তাঁরা সেই সংখ্যা 'ধূমকেতু' নিঃশেষে সংগ্রহ করলেন। নজরুলের নামেও গ্রেপ্তারী

পরোয়ানা ছিল কিন্তু সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি কখন যে অদৃশ্য হয়েছেন, সে-সন্ধান কেউ দিতে পারলো না।

পুলিশের ঘ্রাণশক্তি জীবজগতে সুবিদিত। সুতরাং নজরুলকে আবিষ্কার করতে খুব বেশী দেরী হলো না। একদা সুপ্রভাতে সংবাদ-পত্রে দেখা গেল যে, কুমিল্লায় তিনি মিলেছেন। সেখান থেকে তাঁকে কলকাতায় এনে ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের পুলিশ-আদালতে হাজির করা হলো। বিচারে জেল হলো নজরুলের।

নজরুল তখন হুগলি জেলে। বাঁধন-ভাঙা যাঁর ব্রত, তাঁকে সামলায় কে? হুগলি জেলে তখন রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত আরো অনেক কয়েদী ছিলেন। নজরুল তাঁদের নিয়ে আরম্ভ করলেন জেলের শৃঙ্খলা ভাঙতে, আর জেলের কর্তৃপক্ষও শৃঙ্খল পরাতে লাগলেন তাঁকে ভালো করে বাঁধতে। শাস্তি যখন চরমে উঠলো, নজরুলও তখন চরমে উঠে আহার-ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করলেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি—তাঁকে প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। অনশনের আটাশ দিনে কয়েকজন নজরুল-অনরাগী যুবক এসে আমাকে ধরলে হুগলি জেলে গিয়ে তাঁর অনশন-ব্রত ভঙ্গ করার জন্যে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল আমার অনুরোধ তিনি এড়াতে পারবেন না। কিন্তু নজরুলকে আমি চিনতাম বলেই সে-বিশ্বাস আমার আদৌ ছিল না,—থাকলে আমি বহুপূর্বে স্বেচ্ছাক্রমেই জেলে গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতাম। তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

যুবক কয়টির সঙ্গে রওনা হলাম আমি আর সাহিত্যিক বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। জেলে ঢুকতে পারলাম না;—অনুমতি দিলেন না কর্তৃপক্ষ। ক্ষুণ্ণমনে হুগলি স্টেশনে ফিরে এলাম। নজরে পড়লো প্লাটফর্মের গা ঘেঁষে জেলের পাঁচিল। দেখে মনে হলো, দুর্লঙ্ঘ্য হলেও এ-পাঁচিল ডিঙোনো একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে। আর যদিই-বা ডিঙোতে না পারা যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি? প্রকাশ্য

দিবালোকে এই অপরাধমূলক প্রচেষ্টায় ধরা পড়বো নিশ্চয়ই এবং ধরে জেলের মধ্যেই নিয়ে যাবে এটাও সুনিশ্চিত। সুতরাং নজরুলেব নিকটস্থ হবার এইটিই একমাত্র উপায় বলে স্থির করলাম।

কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। বন্ধুবর পবিত্রকে বললাম, "তুমি উবু হয়ে বসো, আমি তোমার দু'কাঁধে দুটো পা দিয়ে দাঁড়াই। তারপর তুমি আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করো। তোমার ঘাড়ের ওপর থেকে লাফ দিয়ে আমি যদি পাঁচিলের ওপর উঠতে পারি, তুমি আর এখানে থেকো না। সটান সরে প'ড়ো। দু'জনে জেলে গিয়ে লাভ কি?"

তখন বোধহয় বেলা দুটো। প্লাটফর্মে যাত্রী বড় বিশেষ নেই। প্ল্যান মতো কাজ করা হলো। পবিত্র বসলেন উবু হয়ে, আমি তাঁর ঘাড়ের ওপর দাঁড়ালাম, পবিত্রও দাঁড়ালেন; তাঁর ঘাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে কায়ক্লেশে উঠলাম পাঁচিলের ওপর। আমার ওঠার পর পবিত্র স'রে গেছেন। উঠলাম বটে, কিন্তু পাঁচিলের ভেতরের দিকটা দেখে চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল। ভিতরের দিকে দারুণ খাদ। অন্তঃত ২০।২৫ গজের নীচে মাটি। পাঁচিলের ওপরে আমি ঘোড়ায়-চড়া ভঙ্গিতে বসে। জেলখানার ভেতরের মাঠে দেখলাম মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী মহাশয় বেড়াচ্ছেন। তিনিও তখন হুগলি জেলে বন্দী ছিলেন। ভদ্রলোক আমার দিকে হাঁ করে চাইলেন। উচ্চ চীৎকার করে তাঁকে বললাম, "নজরুলকে ডেকে দিন।"

ক্রমে জেলখানার কয়েদীদের দিকে দৃষ্টি পড়ল আমার। দলে দলে ছেলেরা জেলখানার ভেতরের মাঠে জুটতে লাগলো এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখবার জন্যে। এরই ভেতরে দেখি দু'পাশে দু'টি ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে আসছেন নজরুল। বেশীদূর এগোতে পারলেন না,—একটি জায়গায় বসে পড়লেন। অত দূরে আমার চীৎকার হয়তো পেঁছবে না ভেবে আমি জোড়হাত ক'রে তাঁকে খাবার জন্য অনুরোধ করলাম,

প্রত্যুত্তরে নজরুলও জোড়হস্ত হয়ে ইঙ্গিতেই জানিয়ে দিলেন অনুরোধ রক্ষা করতে না পারার কথা।

বলা বাহুল্য, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে স্টেশন-কর্মচারীরা ও কয়েকজন যাত্রী সমেবেত হয়েছেন আমার নিম্নস্থ প্লাটফর্মের ওপর। স্টেশনের বাবুরা গালাগালি দিয়ে আমার চোদ্দ-পুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ করছেন। ঐ ভিড়ের মধ্যে পাঁচিলের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম প্লাটফর্মের ওপর এবং সরাসরি নীত হলাম স্টেশনের মধ্যে। স্টেশনের কর্তারা আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বললেন তাতে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমি বোমা-পিস্তলধারী সন্ত্রাসবাদী দলের কোন সদস্য। যাই হোক, কিছুক্ষণ বাগ্-ধস্তাধস্তির পর কি জানি কেন তারা আমায় মুক্তি দিলেন। পবিত্র ও আমি হতাশ হয়ে ফিরে এলাম। আমার পরে আরও অনেকে অনেক রকম চেষ্টা করেছিলেন নজরুলকে খাওয়াবার জন্যে। তিনি কারও অনুরোধই রক্ষা করেন নি। সর্বশেষে তাঁর মাতৃসমা, কুমিল্লার শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে তিনি আহারে সম্মত হয়েছিলেন। চল্লিশ দিন পরে নজরুল অনশন ভঙ্গ করলেন।

নজরুলের জেলে-থাকা কালে রবীন্দ্রনাথ বসন্তোৎসব করেন কলকাতায় এবং 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি উৎসর্গ করেন অনশনব্রতী নজরুলের উদ্দেশ্যে, "শ্রীমান্ কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু" এই কথা লিখে।

হুগলি জেল থেকে নজরুলকে স্থানান্তরিত করা হলো বহরমপুর জেলে। জেল থেকেই তিনি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে কবিতা পাঠাতেন। তখনকার দিনে কবিতার সাহিত্যিক মূল্য যতই থাক না কেন, আর্থিক মূল্য কিছুই ছিল না (এ বিষয়ে একমাত্র ব্যত্যয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ)। কোনো কাগজের মালিকই কবিতার জন্যে লেখককে টাকা-দেওয়াটা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু মনে করতেন না। জেল থেকে পাঠানো যে-কবিতাগুলি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল, ছোট

বা বড় যে-আকারের হোক, প্রত্যেকটি কবিতার জন্যে দশ টাকা হিসাবে দিয়ে নজরুলকে সম্মানিত করেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

আমার একবার ইচ্ছা হলো বহরমপুর জেলে নজরুলকে দেখতে যাবার। গেলাম বহরমপুরে। জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলাম; বিনা আয়াসেই আবেদন মঞ্জুর হলো। বেলা দশটা। হাজির হলাম জেলের ফটকের সামনে—সেখান থেকে প্রহরীর নির্দেশমতো জেলের আপিস-ঘরে। নজরুলের কাছে খবর গেল। কয়েক মিনিট পরেই নজরুল এলেন। এসেই তিনি জেল-কর্মচারীর ওপর হুকুম করলেন আমার জন্য অবিলম্বে চা ও জলযোগের ব্যবস্থা করতে। এ যেন কোনো বিশিষ্ট অতিথির আগমনের জন্যে তাঁব পরিবারস্থ পাচককে আদেশ দেওয়ার মতো। আমি তো থ। এ আবার কি রকম কয়েদী রে বাবা!

জেলের অফিস-ঘরে অফিসারদের সম্মুখেই আমাদের বিশ্রম্ভালাপ শুরু হলো;—কলকাতা থেকে অন্তর্ধানের পর সেদিন পর্যন্ত আদ্যোপান্ত ইতিহাস। যে সব গান গেয়ে হুগলির জেল কর্তৃপক্ষকে খেপিয়েছিলেন, সে গানগুলিও গাইতে আরম্ভ করলেন। জেলখানার ভেতরে বসে গেল গানের আসর।

ইতিমধ্যে এসে হাজির ট্রে-তে করে চা আর থালার ওপর গরম লুচি আর বেগুন-ভাজা, হালুয়া। সত্যিই নজরুল জেলখানাটিকে নিজের ঘরবাড়ি করে তুলেছেন।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে বাঁধনহারা নজরুল বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হুগলিতে বাসা বাঁধলেন। হুগলি থেকে তাঁকে কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করলেন হেমন্তকুমার সরকার।

নজরুল যখন হুগলিতে ছিলেন, সেই সময় কলকাতায় কমিউনিষ্ট পার্টির একটি সংসদ-সংগঠনের আয়োজন চলছিল লোক-

চক্ষুর অগোচরে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, হেমন্তকুমার সরকার প্রভৃতির পরিচালনায় ৩৭নং হ্যারিসন রোড থেকে এই কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'লাঙল' প্রকাশিত হলো। নজরুল 'চাষীদের গান', 'সাম্যের গান', 'সব্যসাচী' প্রভৃতি কবিতা লিখে 'লাঙল'কে জনপ্রিয় করে তুললেন।

এই সময় নজরুল একদিন রয়েছেন আমার বাড়িতে। দু'টি হিন্দুস্থানী পথচারী ভিখারী—একজন পুরুষ, অপরটি নারী—হারমোনিয়মের সঙ্গে উর্দু গজল গেয়ে উর্ধ্বমুখে চলেছে সারা পল্লীতে মধু-বর্ষণ করতে করতে। নজরুলের একান্ত আগ্রহে আমার বৈঠকখানায় তাদের ডেকে এনে গান শোনার ব্যবস্থা হলো। অনেকগুলি গান শুনিয়ে সুরের ঝঙ্কারে সমগ্র কক্ষটিকে অনুরণিত করে তারা বিদায় নিল। নজরুল বসলেন গান লিখতে। তাদের 'জাগো পিয়া' গানটির রেশ তখনও আমাদের কানে ধ্বনিত হচ্ছে। ভৈরবী রাগিণীর সেই গানটির সুরের কাঠামোতে তিনি রচনা করলেন, 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া, পবাণপিয়া' গানটি। তাঁর গজল গান লেখার শুরু এইখান থেকে। গজল গানের নেশা যেন তাঁকে পেয়ে বসলো। অসি ছেড়ে এই বাঁশী ধরবার জন্যে কয়েকজন উগ্রপন্থী বন্ধু তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করেছিলেন যথেষ্ট। রসের সন্ধান পেলে কবি-প্রাণের অপ্রতিহত গতিমুখে সকল বাধাই তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যায়। এক্ষেত্রেও তাই হলো। নজরুল এজন্যে কয়েকজন রাজনৈতিক চরমপন্থীর বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন।

কিন্তু অনুরাগ জাগলো অন্যত্র। গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারলেন নজরুলের গানে কাব্যরস যে পরিমাণেই থাক না কেন, গব্যরসও আছে যথেষ্ট। সুতরাং তাঁরা এ-সুযোগ ছাড়লেন না। তাঁরা নজরুল-দোহনের একটা পাকা ব্যবস্থা করে ফেললেন। গ্রামোফোন কোম্পানিতে গিয়ে তার আর্থিক সমস্যার সমাধান খানিকটা হলো বটে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলো বাংলার রস-সাহিত্য।

গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্যে লেখা অধিকাংশ গানই তাঁর প্রাণের প্রেরণায় নয়—পেটের জ্বালায়। অমুক গায়ক বা গায়িকার জন্যে অমুক ধরনের গান, এই জাতীয় সুরের কাঠামোতে এতটুকু পরিসরে, এতটা সময়ের মধ্যে বেঁধে দিতে হবে—এই রকম ফরমাশে রচিত পাইকারি গানে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়ে অচিন্তিতপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তিনি। কিন্তু নজরুল-প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ স্বাধীন-প্রেরণা-সম্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারলো না—বাংলা-সাহিত্য তথা বাংলাদেশের এ দুঃখ চিরকাল রয়ে যাবে।

হঠাৎ একটি বজ্রাঘাত হলো নজরুলের সংসারে। তাঁর চার বছর বয়সের শিশুপুত্র বুলবুল মারা গেল বসন্ত রোগে। ছেলেটি ছিল যেমন সুন্দর, তেমনি মধুর।

নজরুল যেন ভেঙে পড়লেন এই একান্ত অবলম্বনস্বরূপ পুত্রটিকে হারিয়ে। কিছুদিন পরে তিনি সে শোক সামলে উঠলেন। কিন্তু বাইরে আনন্দমুখর হয়ে উঠলেও তাঁর অন্তরের আগুন নেভেনি তখনও। বাইরের কোনো-কিছুর মধ্যে না পেয়ে তিনি শান্তির সন্ধান করবার চেষ্টা করলেন অধ্যাত্ম-রাজ্যে। লালগোলা হাইস্কুলের হেডমাস্টার বরদাচরণ মজুমদার ছিলেন একজন গৃহী যোগী। তাঁর আধ্যাত্মিক উচ্চ অবস্থা ও অলৌকিক শক্তির কথা নজরুল জানতেন। ছুটে গেলেন বরদাচরণের কাছে। অন্তরে বিপুল প্রশান্তি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। অধ্যাত্ম-শক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধন-পথে স্বভাবতঃই যে অশুদ্ধ শক্তির দারুণ বাধা এসে দাঁড়ালো, তাকে অতিক্রম করতে নজরুল সমর্থ হলেন—এটা আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও তাঁকে এজন্যে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হলো। আজ পর্যন্ত সে ক্ষতির পূরণ হয়নি। বিপুল প্রাণশক্তির আধার বলেই সে আসুরী শক্তির কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করে সাময়িকভাবে তিনি আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন। এর পর থেকেই নজরুলের জীবনের যেন আর-একটি মোড় ফিরে গেল। ধর্মসাধনায় তিনি একাগ্র হলেন। সঙ্গে সঙ্গে

চললো কোরান-পুরাণ-তন্ত্র-উপনিষদ প্রভৃতির অনুশীলন। এই সময়ে রচিত সাধনসঙ্গীতগুলি সেই সাধনারই বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু নজরুলের মন অন্তর্মুখীন হলেও, তাঁর বাইরের আনন্দ উৎসাহ কিছুমাত্র কমেনি, বরং বেড়েছিল। এ-দেশের সিনেমায় যখন বাণীচিত্রের পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী সবে শুরু হয়েছে—দেখা গেল 'ধ্রুব' নাটকে নারদের ভূমিকায় নজরুল। তাঁর 'আলেয়া' গীতিনাট্য তখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছিল। যিনি তাতে কবির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন হঠাৎ তিনি পূর্বাহ্নে কোনো সংবাদ না দিয়ে একটি অভিনয়-রজনীতে অনুপস্থিত। নজরুল স্বয়ং সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দর্শকদের বিস্মিত ও পুলকিত করে তুললেন।

অধ্যাত্ম-সাধন-কালে জীবনের এই নবতম অধ্যায়ে তাঁর সৃজনী প্রতিভারও নূতন নূতন দ্বার খুলে গেল। বহু লুপ্তপ্রায় রাগরাগিণী তিনি সঙ্গীতবিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সেইসব সুরে গান রচনা করতে লাগলেন। কেবল তাই নয়—নির্ঝরিণী, রেণুকা, মীনাক্ষী, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা ও দোলনচম্পা নাম দিয়ে কয়েকটি নূতন রাগিণীরও সৃষ্টি করলেন তিনি। কলকাতা বেতার-প্রতিষ্ঠানে 'হারামণি' ও 'নবরাগমালিকা' অনুষ্ঠানগুলিতে তিনি এই অসাধারণ শক্তির পরিচয় বেতার-শ্রোতৃবৃন্দকে দিয়েছেন।

যে-সময়ে তাঁর ভেতর থেকে এই নূতন নূতন শক্তির স্ফুরণ হচ্ছে, সঙ্গীতে একটা নূতন রসের প্লাবন এসেছে, সে-সময় সদানন্দ নজরুল পারিবারিক অশান্তিতে প্রপীড়িত। স্ত্রী পক্ষাঘাত রোগে পঙ্গু—অজস্র অর্থব্যয়—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল রকম চিকিৎসায় বিফলতা প্রভৃতিতে তিনি এক-একদিন দিশেহারা হয়ে পড়তেন। তাঁর বর্তমান অসুখেরও উদ্ভব এই সময়েই।

নজরুলের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের যেটুকু জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে লিখতে গেলে একখানি বৃহদাকার গ্রন্থ হয়ে পড়ে। সাহিত্যে নজরুল, সঙ্গীতে নজরুল, সভা-সমিতিতে নজরুল'

আড্ডা-মজলিসে নজরুল, দেশব্যাপী বন্দনায় নজরুল, দ্বেষদুষ্ট লাঞ্ছনায় নজরুল, দাবাখেলায় আত্মভোলা নজরুল, ফুটবল-মাঠে আত্মসচেতন নজরুল, রঙ্গরসে নজরুল, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে নজরুল, যোগী নজরুল, ভোগী নজরুল, হস্তরেখা-পাঠে অধ্যবসায়ী নজরুল, 'কলগীতি'-পাঠে অধ্যবসায়ী নজরুল ;—কোথায় কিসে নেই নজরুল ? কিন্তু এ ছোট ছোট টুকরোগুলো জোড়া দিলে যে সম্পূর্ণ আকার রূপ-পরিগ্রহ করে, সেই নজরুল-মানুষটি এ-সবের সমষ্টির চেয়ে আরো বড়। যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁরাই এ-সত্য উপলব্ধি করেছেন।

বিংশ শতাব্দার কোলে নজরুল যেন উনবিংশ শতাব্দীর বিদায়-কালীন প্রীতি-উপহার !

কবিস্বীকৃতি

....

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলাম ব্যক্তিটি সম্পর্কে আজ জনসাধারণের প্রবল আগ্রহ তাঁর বোবা জীবনকে সহনীয় তথা রমণীয় করার প্রয়াসে ভারতে ও পাকিস্থানে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু কবি নজরুল ইসলামের কবিকৃতির আলোচনা সাহিত্য বিচারক ও সাহিত্য গবেষকদের মধ্যে তেমনভাবে লক্ষ্যণীয় নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নজরুল রচনা-সম্ভার প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে নজরুল সাহিত্যের চাহিদা তেমন লক্ষ্যণীয় নয়। নজরুল জন্মদিনে যাঁরা পুষ্পস্তবক নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে যান, তাঁদের সেই কবির প্রতি ব্যক্তিভক্তি তাঁর রচনানুরাগে পরিব্যপ্ত নয়। প্রমাণ-স্বরূপ বলতে পারি যে নজরুলের সেদিনের শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী সঙ্গীতগুলির কোন সংগ্রহ বাজারে প্রচলিত নেই। চাহিদা থাকলে নিশ্চয়ই পুস্তক-ব্যবসায়ীরা তা সাগ্রহে প্রকাশ করতেন। দু-চারখানা সংকলন গ্রন্থ ছাড়া নজরুলের কবিতা, গান ও গদ্য-রচনাগুলি ইতিমধ্যেই অপ্রচলিতত্বে পৌঁছে গেছে।

নজরুল সম্পর্কে আজহারউদ্দিন খাঁ। বন্ধুবর মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ-এর আলোচনা গ্রন্থে নজরুলের বিচিত্র জীবনের তথ্য যতখানি আছে, ঘটনা সন্নিবেশে 'বিদ্রোহী' রচনার স্থান-কাল নির্ণয় নিয়ে বিতর্কও আছে। কিন্তু তাঁর রচনার সাহিত্যিক মূল্য বিচার নিয়ে কোন আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমি জানি না।

'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয়'—এ কথা স্বয়ং

কবিগুরুই বলেছেন। কিন্তু কাবর কাব্যের ধারাবাহিক মূল্যায়নে যতখানি প্রয়োজন কবির জীবন-কাহিনীতে তার বেশি ঘটনা খোঁজার আগ্রহ কবিস্বীকৃতির অনুকুল নয়।

নজরুল নিজে তাঁর কবি পরিচিতির চেয়ে জাতীয় সৈনিক পরিচিতিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ যুগের হুজুগ কেটে গেলে বাঁচা-মরা নিয়ে পরোয়া করেন নি তিনি, কিন্তু সেদিনের যুগচেতনার তিনিই যে ছিলেন মূর্ত বাণীরূপ, এ কথা যাঁরা সেদিন তরুণ ছিলেন তাঁরা সবাই আজও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। যুগের হুজুগ কেটে গেলে যে কবি বাঁচেন না তাঁর প্রকৃত কবি-মনীষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করার রেওয়াজ আছে। কিন্তু যুগ-মানসকে কাব্যে রূপায়িত করাও যে মহাকাব্যের লক্ষণ, এও সর্বজনস্বীকৃত।

আজকের এই 'ঝুটা আজাদী'র প্রতি ধিক্কারে মুখর তরুণ সমাজ কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারে না সেদিন পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে চাওয়ার আবেগ কি পরিমাণ প্রবল ছিল। কি গভীর ছিল ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণের আবেগ ও জনমনে তার প্রভাব।

সেদিনের তরুণ গণমানসকে আজ যদি খুঁজে বার করতে হয়, তাকে ধরাছোঁয়া নাগালের মধ্যে পেতে হয়, তবে একমাত্র নজরুলের কবিতা, গান ও অনেকগুলি গদ্য-রচনার মধ্যেই তা আজও পাওয়া যাবে। আর যে বলিষ্ঠ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি কবিতার বিশেষ সম্পদ, সেদিক দিয়ে নজরুলের প্রয়াস অতুলনীয়। বস্তুত বাঙলা কবিতায় সাম্যবাদী চেতনা ও গণসংগ্রামের আহ্বানের নজরুলই পথিকৃৎ।

নজরুলের রোমান্টিক কবিতা, দেশবন্ধু সম্পর্কিত শোক কবিতাগুলি ও তাঁর বিচিত্র গীতিসম্ভার—নজরুল-সাহিত্যের আর এক দিক।

নজরুলের আযৌবন বন্ধু ও সাথী হিসেবে আমি মানুষটিকে তাঁর কবিতার চেয়ে অনেক বেশি চিনেছি এবং ভালোবেসেছি। তা ছাড়া কাব্যের চুলচেরা সাহিত্যিক বিচার করার মত বিশ্লেষণমূলক

মানসিকতাও আমার নেই। আমি কবিতার বিচার করি কবিতা পাঠের মানসিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে, আমার সেই মানসিক বিচারে নজরুল সার্থক কবি।

নজরুলের কবি প্রতিভার মূল্যায়নে এ যুগ নীরব ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু সে যুগ ছিল বিতণ্ডামূলক। অন্তত রবীন্দ্র-অনুচরদের মধ্যে অস্বীকৃতির প্রয়াস যথেষ্ট ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্‌ধৃতি দিয়ে কবিকে নস্যাৎ করতেন অনেকে। নজরুলের কাব্যপ্রয়াস ছিল 'তরোয়াল দিয়ে দাড়ি চাঁছা'!

অথচ নজরুলের রচনায় অসির ঝঞ্ঝনাও সার্থক কবিতা হয়ে উঠেছে এমন স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দিয়েছিলেন ১৩২৯ সালের ফাল্গুনে প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যের উৎসর্গ-পত্রে—বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছিল—শ্রীমান্ কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু।

নজরুলের কবিস্বীকৃতি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক উল্লেখেই সীমায়িত রাখেন নি কবিগুরু। নজরুলকে কবিস্বীকৃতি দিয়ে কবি যে ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছিলেন, সেই ভীমরুলদের হুল ফোটানোর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে যে সব উক্তি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা আমার স্বকর্ণে শোনা।

নজরুল তখন আলিপুর সেন্‌ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ। আমি প্রতি সপ্তাহেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমার সঙ্গে নজরুলের নিয়মিত যোগাযোগের খবর নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁচেছিল, নইলে মধু রায়ের গলির মেসে স্নেহভাজন বুলা মহলানবীশকে পাঠিয়ে আমাকে জোড়াসাঁকোয় ডাকিয়ে নিতেন না গুরুদেব। একবার সুবিধা মতো দেখা করবার কথা বললেন বুলাবাবু। কিন্তু ঠাকুর সন্দর্শনে কালবিলম্ব অনুচিত বিবেচনা করে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম এবং বুলাবাবুর সঙ্গে গল্পে গল্পে কয়েক পা হেঁটেই জোড়া-সাঁকোর বিচিত্র ভবনে এসে হাজির হলাম। সেখানে অনুচর তথা গুরুজন পরিবৃত হয়ে কবিগুরু আসীন। আমাকে দেখে প্রথমে

কুশল প্রশ্ন করে নজরুলের খবর জানতে চাইলেন এবং আমি যে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত দেখা করি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন আমাকে প্রশ্ন করে। বললেন, জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সন্থ প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি। সেখানা নিজের হাতে তাকে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমি যখন নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারছি না, ভেবে দেখলাম, তোমার হাত দিয়ে পাঠানোই সবচেয়ে ভালো, আমার হয়েই তুমি বইখানা ওকে দিও।

কোনো বিষয়েই আপনার প্রতিনিধিত্ব করবার ধৃষ্টতা আমার নেই, আমি বললাম। বরং আপনার অনুগ্রহ-আদেশ পেলে বন্ধু নজরুলের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার কাছ থেকে হাত পেতে আপনার উৎসর্গীত গ্রন্থখানা গ্রহণ করব, সঙ্গে আপনার আশীর্বাদ আমি বয়ে নিয়ে যাব তাঁর কাছে। এ দুর্লভ সুযোগ কি করে আমি ছাড়ি বলুন, বন্ধুভাগ্যে যদি কিছু পাই তাই আমার পরম পাওয়া!

কথার মারপ্যাঁচ তো বেশ শিখেছ পবিত্র।

শুনে অমল হোম মন্তব্য করলেন, বীরবলী কাব্যবিন্যাসের পরিবেশে বাস করেন তো উনি।

আমি জবাব করি, বাস করি না, করতাম। তবে আপাতত যাঁর প্রতিভূ হয়ে এসেছি তিনি কিন্তু সরল সহজ ভাষায় বক্তব্য পেশ করেন। কবির ইঙ্গিত পেয়ে আমি ততক্ষণে ফরাসের উপর বসে পড়েছি।

কবি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, বিদগ্ধ বাগ্‌বিন্যাসের যেমন মূল্য আছে, সহজ সরল তীব্র ও ঋজু বাক্যের মূল্যও কিছু কম নয়!

কিন্তু সহজ সরল তীব্র ও ঋজু বাক্য মাত্রই কবিতা বা সাহিত্য হয়ে ওঠে না, মন্তব্য করলেন অমল হোম।

কখ্‌খনো নয়। তীব্রতাই যদি কাব্যগুণের আধার হতো, তাহলে

তোমার প্রতিটি কথাকেই তো কবিতা বলা যেত। তীব্রতাও রসাত্মক হলেই কাব্য হয়ে ওঠে। যেমন উঠেছে নজরুলের বেলায়।

সবাই চুপচাপ। দু-চারটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি কবির দিকে নিবদ্ধ। একটু থেমে আবার তিনি বললেন, নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে তোমাদের মনে যেন কিছু সন্দেহ রয়েছে।

তখনো সবাই নীরব।

এবার কবি যেন বক্তব্য পেশ করতে চান। তবে তাতে কৈফিয়তের সুর নেই।

নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গ-পত্রে তাকে 'কবি' বলে অভিহিত করেছি। জানি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পারে নি। আমার বিশ্বাস, তারা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করছে। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করেনি, অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছে মাত্র।

মার্ মার্ কাট্ কাট্ ও অসির ঝন্ঝনার মধ্যে ও রসের প্রক্ষেপটুকুও হারিয়ে গেছে, উপস্থিত একজন মন্তব্য করলেন।

কাব্যে অসির ঝন্ঝনা থাকতে পারে না, এও তোমাদের অদ্ভুত আবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে বাঁধা, অসির ঝন্ঝনায় যখন সেখানে ঝংকার তোলে, ঐকতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করতে হবে বৈকি! আমি যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও ওই সুর বাজত।

কিন্তু তার রূপ হতো ভিন্ন। আর একজনের মন্তব্য শোনা গেল।

দু'জনের প্রকাশ তো দু'রকম হবেই কিন্তু তা বলে আমারটা নজরুলের চেয়ে ভাল হতো, এ-কথাই বা জোর করে বলবে কি করে।

যাই বলুন, এ অসির ঝন্ঝনা জাতির মনের আবেগে ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নজরুলী কাব্যের জনপ্রিয়তাও মিলিয়ে যাবে, মন্তব্য এল ফরাস থেকে।

জনপ্রিয়তা কাব্য বিচারের স্থায়ী নিরিখ নয়, কিন্তু যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য।

সবাই চুপচাপ। প্রসঙ্গান্তর তুলে কবি জানতে চাইলেন, আমি কবে যাব নজরুলের কাছে?

আমি জানালাম বুধবারে আমার ইণ্টারভিউর দিন।

কে যেন দু'কপি 'বসন্ত' এনে দিল কবির হাতে। তিনি একখানায় নিজের নাম দস্তখত করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, তাকে বোলো, আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না করে। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর বোলো, কবিতা লেখা যেন কোন কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জোগাবার কবিও তো চাই।

জেলের ইণ্টারভিউ, নিয়মমাফিক গরাদের ব্যবধানে আমি প্যাকেট খুলে গুরুদেবের উৎসর্গ-পত্র দেখাতেই নজরুল লাফ দিয়ে পড়লেন লোহার গরাদগুলির উপর! বন্দীর প্রবল উত্তেজনা লক্ষ্য করে ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডার কারণ জানতে চাইল। আমি যখন বললাম, পোয়েট টেগোর ওঁকে একখানা বই ডেডিকেট করেছেন। সাহেব আমার ইংরেজীর ভুল ধরে বলল, ইউ মীন প্রেজেণ্টেড? আমি জোর দিয়ে বললাম, নো, ডেডিকেটেড।

সাহেবের মুখে বিস্ময়।

ইয়ো মীন দী কন্‌ভিক্ট ইজ সাচ্ অ্যান ইমপর্টাণ্ট পারসন।

ইয়েস, আওয়ার গ্রেটেস্ট পোয়েণ্ট নেকস্‌ট টু টেগোর।

এক সেকেণ্ড কি ভেবে সাহেব দরজাটা খুলে আমাদের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করলেন নজরুল। তারপর হঠাৎ খেয়াল হতে ছিটকে পড়া বইখানা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বুকে চেপে ধরলেন।

দু'কপির অপর কপি চেয়ে নিল ওয়ার্ডার সাহেব।

উত্তেজনা একটু প্রশমিত হতে নজরুল জিজ্ঞাসা করলেন, আর কি বলেছেন গুরুদেব ?

বলেছেন তুই যেন কবিতা লেখা বন্ধ করিস না।

গুরুর আদেশ শিরোধার্য বলে সেদিন আমাকে বিদায় করেছিলেন নজরুল। নজরুলের কবিত্বে প্রত্যয় ছিল বলেই কবি তাঁকে ওই নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। অসি ঘোরাতে বলেন নি, কবিতায় অসির ঝন্‌ঝনা প্রকাশের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামী চেতনা উদ্বোধনের গান গাইতে।

আমার বন্ধু নজরুল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কাজী নজরুল আমার বাল্যবন্ধু। এক দেশে বাড়ি, একসঙ্গে পড়েছি, একসঙ্গে একই দিনে কলকাতায় এসেছি।

আমরা যখন স্কুলে পড়তাম সেই সময়ের একটি গল্প বলি।

রানীগঞ্জ শহরের পাশ দিয়ে রেলের যে লাইনটা চলে গেছে, শুনলাম সেই লাইনের ওপর সাঁওতালদের একটি মেয়ে ট্রেনে কাটা পড়েছে। মেয়েটার মৃতদেহ দেখবার জন্যে লোকজন ছুটছে সেই দিকে। স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে। নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে আমিও ছুটলাম। গিয়ে দেখি, সব ভোঁ-ভাঁ। কোথায়-বা মৃতদেহ, কোথায়-বা লোকজন! কেউ কোথাও নেই। কাকেই বা জিগোস করি?

নজরুল তখন দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে গান ধরেছে—

আহা কি দেখালে হরি!
শ্যামের বামে রাই-কিশোরী

দূরে একজন লোক ছাতি মাথায় দিয়ে লাইন পার হচ্ছিলো। তাকেই জিগ্যেস করলাম, ও মশাই, শুনছেন?

লোকটি থামলো।

—সাঁওতালদের একটি মেয়ে এইখানে কাটা পড়েছিলো—জানেন?

লোকটি বললো, জানি। পুলিশ তাকে তুলে নিয়ে গেলো।

—যাঃ, সব শেষ হয়ে গেছে। আরো আগে আসলে হতো।

রেল-লাইনের পাশেই 'বেঙ্গল কোল-কোম্পানি'র কাছারি-বাড়ি যাবার পাকা রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে বড়ো বড়ো গাছ। নজরুল তখন লাইন ছেড়ে দিয়ে সেই রাস্তায় গিয়ে নেমেছে। বললাম, ওদিকে কোথায় যাচ্ছো? চলো বাড়ি যাই।

নজরুল বললো, আমি আর হাঁটতে পারছি না। এইখানে বসলাম।

গাছের তলায় কচি কচি ঘাস। মাথার ওপরে গাছের ডালপালা আকাশটাকে ঢেকে দিয়েছে। ছায়াস্নিগ্ধ জায়গাটি বড়ো মনোরম। ঘাসের ওপর নজরুল শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে বুক বাজিয়ে গুন্ গুন্ করে গান করতে লাগলো।

গাছের তলায় আমরা দু'জন তখন পাশাপাশি শুয়ে। হঠাৎ মোটরের হর্নের শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি পথের ওপর একখানা মোটর গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। হুড্ খোলা মোটর। গাড়ি চালাচ্ছিলো একজন সাহেব। আমাদের দিকে তাকিয়ে কি যেন জিগ্যেস করছে।

নজরুল বললো, আমাদের বলছে। চলো, শুনি কি বলছে।

দু'জনে এগিয়ে গেলাম গাড়ির কাছে। কিন্তু কি যেন বলছে ইংরেজিতে, কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমরা তখন সেই আগেকার দিনের সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র। ইংরেজি বই আমরা পড়ি স্কুলে, কিন্তু তাই বলে খাস ইংরেজের মুখের কথা বোঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই। নজরুল তাকাচ্ছে আমার দিকে, আমি তাকাচ্ছি তার দিকে। সাহেবের পাশে যে ইংরেজ মহিলা বসেছিলেন, তিনি বোধহয় বুঝতে পারলেন, আমরা ইংরেজি কথা বুঝতে পারছি না! তখন তিনি নামলেন গাড়ি থেকে।

পেছনের সিটে কমবয়েসী যে মেয়ে দু'টি বসেছিলো, তাদের খুব মজা লেগেছে। আমাদের দিকে তাকাচ্ছে আর হাসছে।

যে-মেয়েটি নামলেন গাড়ি থেকে তিনি পরিস্কার বাংলায় বললেন, ছেলে সকল। এসোন্‌শোল কেটো ডুরে বলিতেছি।

তাঁর বাংলা শুনে নজরুল তো হেসেই খুন! ছেলে সকল কি রে বাবা? আমরা দু'জন হলাম গিয়ে boys—মানে ছেলে সকল।

ভদ্রমহিলা বললেন, এ হাসিটেছে কেনো?

—তোমার বাংলা শুনে হাসছি মা-ঠাকরুণ! বললো নজরুল।

মা-ঠাকরুণ তখন আমার দিকে তাকালেন। বললেন, ও কি বলিটেছে?

আমি বললাম. বলছে—এটা আসানসোলের রাস্তা নয়। আপনারা ভুল পথে চলে এসেছেন।

হাসি থামিয়ে নজরুল এগিয়ে এলো। বললো, এটা ভুল পথ। যে-পথে এসেছো আবার সেই পথে ফিরে যাও। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরো গিয়ে।

ভেবেছিলাম বাংলা-জানা মেমসাহেব এবার সবই বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু না, কিছুই বোঝেন নি। বরং উল্টো বুঝেছেন।

আজও আমার মনে আছে—কী বিপদেই না পড়েছিলাম সেদিন। আমি যতো বলি—আপনাদের ভুল হয়েছে, উনি ততো বলেন—নো। ভুল আমার হইটে পারে না। তাঁর সে কী রাগ!

প্রথমে আমিও বুঝতে পারিনি—তাঁর রাগের কারণটা পরে বুঝেছিলাম। ভদ্রমহিলা ভেবেছিলেন, আমি বুঝি তাঁর বাংলাভাষার ভুলের কথা বলছি। তাঁরও দোষ নেই। যতোই তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, একদিক থেকে গাড়ির পেছনের সিটের মেয়ে দুটো খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে, আর একদিক থেকে নজরুল তার দুর্বোধ্য বাংলাভাষায় নানারকম টিপ্পনি কাটতে থাকে।

শেষে অতি কষ্টে গ্রামার বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ইংরেজি বলে মেম সাহেবকে বুঝিয়ে দিলাম—ইউ হ্যাভ্ কাম হিয়ার বাই মিস্‌টেক্, মেমসাহেব। ইট্ ইজ্ আওয়ার রানীগঞ্জ। ইট্ ইজ্ নট্ আসানসোল।

নজরুল বললো, গো ব্যাক্ এণ্ড্ ক্যাচ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।

আবার আর এক বিপদ! কোথায় গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড? কোন্ দিকে? অথচ সেই রাস্তা ধরেই তাঁদের আসতে হয়েছে। হাত বাড়িয়ে আঙুল বাড়িয়ে লেফট্ বলে রাইট্ বলে এদিকে ঘুরে ওদিকে ঘুরে কিছুতেই যখন তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারলাম না, মেমসাহেব নিজেই তখন তার মীমাংসা করে দিলেন। হাত ধরে আমাদের দু'জনকে তুলে নিলেন তাঁর গাড়িতে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মেমসাহেব পেছনে গিয়ে বসলেন তাঁর মেয়েদের সঙ্গে। আমাদের বসতে হলো সুমুখের সিটে—সাহেবের পাশে। মোটরকারে বসতে পেয়েছি, আমাদের সে কী আনন্দ! মোটর গাড়ি তখন আমাদের ওদিকে একরকম নেই বললেই হয়।

গাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়া হলো। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামলো।...শহরের পথে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সেখান থেকে খুব কাছে নয়। অনেকখানি পথ। যাবার সময় না হয় মোটরে গেলাম, কিন্তু ফিরবো কেমন করে?

নজরুলকে চুপি চুপি জিগ্যেস করায় ও বললো, পায়ে হেঁটে।

বললাম, অনেক রাত্রি হয়ে যাবে।

নজরুল বললো, হোক না!

বললাম, তোমার কি! তোমাকে তো কেউ কিছু বলবে না' রাত্রি হলে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। খুব বকবে।

নজরুল বললো, তাহলে অতদূর গিয়ে কাজ নেই।

পরোপকার করতে গিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে রানীগঞ্জ শহর পর্যন্ত হেঁটে আসা সত্যিই এক বিড়ম্বনা। কিন্তু গাড়ি থেকে নামবার ইচ্ছা কারও ছিলো না! বাধ্য হয়ে ফিডার রোডের ওপর গাড়ি থামাতে বললাম।

—এবার এই রাস্তা ধরে আপনারা সোজা চলে যান। যে রাস্তায় গিয়ে পড়বেন সেইটেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। তারপর সোজা বাঁ দিকে চলে যাবেন। যেখানে দেখবেন—রাস্তার দু'পাশে বড়ো বড়ো বাড়িঘর দোকান-পসরা-হাট-বাজার, সেইটেই আসানসোল।

সাহেব বুঝলেন না, কিন্তু মেমসাহেব বুঝতে পারলেন।

আমরা নামলাম গাড়ি থেকে।

তখন আমরা স্কুলের ছাত্র। তার ওপর পরাধীন দেশ। ইংরেজ জাতটার ওপর খুব খুশি নই আমরা। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝছি—ইংরেজ জাতি হিসেবে খুব ভদ্র। আমাদের গাড়ি থেকে

নামিয়ে দিয়ে অনায়াসে গাড়ি ছুটিয়ে তারা চলে যেতে পারতো। আমরা কতোটুকু উপকারই বা করেছি তাদের! তাদেরই গাড়িতে চড়ে এসে তাদের শুধু পথটা চিনিয়ে দিয়েছি।

এই কৃতজ্ঞতার ঋণটুকু তারা পরিশোধ না করে দিয়ে সেখান থেকে নড়লো না। সাহেব, মেমসাহেব, এমন-কি মেয়ে দু'টিও নামলো গাড়ি থেকে। তারপর প্রত্যেকে আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে হ্যাণ্ডসেক করে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ।

ভদ্রমহিলা কিন্তু শুধু হ্যাণ্ডসেক করেই ক্ষান্ত হলেন না। আমাদের দু'জনের দু'টি হাত জড়িয়ে ধরে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন, গড্ ব্লেস্ ইউ, মাই চাইল্ড!

তারপর জনবিরল সেই শহরতলির পথের ওপর দিয়ে স্বল্পালোকিত সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়িখানি অদৃশ্য হয়ে গেলো। জীবনে আর কোনদিনই তাদের সঙ্গে দেখা হবে না জানি। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, সম্পূর্ণ অপরিচিতা অনাত্মীয়া এই ইংরেজ মহিলা। তবু সেই মুহূর্তটি আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আমার জীবনে।

বাড়ি ফেরার পথে নজরুল গম্ভীরভাবে বলেছিলো, ইংরেজিটা শিখতে হবে। আমাদের স্কুলের সেকেণ্ড টিচার বলতেন, ইংরেজি শিখতে হলে রোজ ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ো আর স্কুলের লাইব্রেরী থেকে ইংরেজি গল্পের বই নিয়ে গিয়ে পড়বার চেষ্টা করো।

স্কুলের লাইব্রেরী থেকে বই আনতে আরম্ভ করলাম। দু'চার পাতা পড়ি আর শক্ত কথার মানে বোঝবার জন্যে ডিক্সনারি খুলি। এমনি করে অভিধান দেখে মানে বুঝে বুঝে গল্পের বই পড়তে আর কতোদিন ভালো লাগে? বই আনি আর ফেরত দিয়ে আসি। আবার আনি, আবার ফেরত দিই। বই আর আনবো না বলে প্রতিজ্ঞা করলাম। মিছিমিছি সময় নষ্ট হচ্ছে।

যে বইখানা এনেছিলাম সেইখানা ফেরত দিতে গেছি, লাইব্রেরীয়ান

বললেন, হ্যাঁ, এমনি করেই তো বই পড়তে হয়। এবার 'ভেন্‌ডেটা' নিয়ে যাও।

ভেবেছিলাম বই আর আনবো না, কিন্তু চার-পাঁচজন ছাত্র-বন্ধু দাঁড়িয়েছিলো কাছেই। তাদের সুমুখেই কথাটা বললেন তিনি। লজ্জায় পড়ে গেলাম। বললাম, দিন তবে—

নজরুলের কাছে গিয়ে দেখি সেও এসেছে দু'খানা মোটা মোটা বই। তার বই-এর নাম আমার মনে নেই।

'ভেন্‌ডেটা' পড়তে গিয়ে দেখি—গল্পটা ভারি মজার। বেশ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সব বুঝতে পারছি না তবু পড়ছি, নজরুল কিন্তু বই পড়া দূরে থাক বই-এর পাতাও ওল্‌টাচ্ছে না।

প্রায়ই দেখছি বই দু'খানা তার ডুগি-তবলার কাজ করছে। মোটা মোটা বই, বাজাবার সুবিধে হয়েছে ভালো।

ইংরেজি শেখবার আর একটা ফন্দী বের করলাম।

শেকার সাহেব জাতিতে কি—কিছুই জানি না। চেহারা দেখে সাহেব-সাহেব মনে হয়। গায়ের রং এককালে খুব ফরসা ছিলো। এখন বুড়ো হয়েছে। বাংলাদেশের জল-হাওয়ায় সাদা রং কেমন যেন একটু মেটে-মেটে হয়ে গেছে। বেঁটেখাটো মোটা-সোটা মানুষটি, চোখে চশমা, হাতে একটি মোটা লাঠি। কোনদিন দেখি, থলে হাতে বাজার করতে যাচ্ছে। আবার কোনদিন দেখি—চেন দিয়ে বাঁধা প্রকাণ্ড একটা এ্যাল্‌সেসিয়ান কুকুর তার সঙ্গে।

সেদিন তাকে দেখেই হঠাৎ আমার মনে হলো—ভালো ইংরেজি শিখতে হলে এই সাহেবের শরণাপন্ন হতে হবে।

ছুটে গিয়ে বললাম সাহেবকে, গুড্‌ মর্নিং মিষ্টার শেকার।

শেকার সাহেবের সঙ্গে সেদিন কুকুর ছিলো না। নির্ভয়ে এগিয়ে গেলাম। সাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, গুড্‌ মর্নিং। হু আর ইউ?

বললাম, গ্র্যাণ্ড সন্ অভ্‌ রায়সাহেব চ্যাটার্জি।

সাহেব আমার কাঁধে হাত রাখলো। বললো, ভেরি গুড.। কি বলছো। বাংলায় বলো, আমি বাংলা জানি।

সর্বনাশ! এ বলে কি?

বললাম, না সাহেব, বাংলায় বলবো না। ইংরেজিতে বলবো। I shall go to your house.

ভেবেছিলাম ইংরেজিতে জবাব পাবো। কিন্তু ইংরেজির ধার-পাশ দিয়েও সে গেলো না। পরিস্কার বাংলায় বললো, পয়সা নিয়ে যেয়ো কিন্তু। দু'আনায় একটা মস্তবড়ো পাকা পেঁপে দেবো। পেয়ারা দেবো আনায় দু'টি।

সাহেব গরিব। পেঁপে, পেয়ারা, ডিম, কলা বিক্রি করে জানি। কিন্তু ইংরেজিতে কথা যদি সে না বলে?

বলতে তাকে হবেই। আমাদের উদ্দেশ্য তাকে বুঝিয়ে বলবো। বলবো, আমরা তোমার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলাবলি করবো। ইংরেজি ভাষাটা আমরা ভালো করে শিখতে চাই।

এই আশা নিয়েই নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম সেদিন শেকার সাহেবের কাছে। আমাদের বাড়ির কাছেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে শেকার সাহেবের বাংলো। চারিদিকে ফলের গাছ আর ফুলের বাগান। তারই মাঝখানে ছোটো একটি একতলা বাড়ি। ছবির মতন দেখতে। গাছের তলায় কতকগুলো মুরগি ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাঁস, পায়রা আর বড়ো বড়ো পেরু রয়েছে দেখলাম। ফুলের বাগানের মাঝখান দিয়ে পথ। পথের দু'পাশে বড়ো বড়ো ফুল ফুটে রয়েছে। কতো রকমের কতো রঙের ফুল। বিদেশী ফুল বোধহয়। তাদের নামও জানি না।

নজরুল বললো, বাঃ, বাড়ির কাছেই এইরকম একটা জায়গা আছে, আগে বলোনি তো! রোজ আসবো।

বললাম, ইংরেজি বলো। এখানে বাংলা নয়।

নজরুল বললো, গ্রামারে যদি ভুল হয়ে যায়। সাহেব হাসবে তো!

বললাম, হাসুক, তবু বলবো।

নজরুল বললো, সাহেবকে হাসতে হবে না। আমি নিজেই হেসে ফেলবো।

কুকুরের ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি সাহেবের সেই বাঘের মতো এ্যালসেসিয়ান কুকুরটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। নজরুল তো আমাকে টানতে টানতে ছুটে একেবারে গেটের বাইরে। ওদিকে সাহেব তখন চেঁচাচ্ছে—তোমরা এসো। টম কিছু বলবে না। তোমরা এসো।

নজরুল বললো, ওটা কুকুর, কে বললে? ওটা তো বাঘ।

বললাম, দেখতে বাঘের মতো। এ্যালসেসিয়ান কিনা।

নজরুল বললো, যেই হোক, বৈষ্ণব তো নয়। চলো পালাই।

কি করবো ভাবছি। এমন সময় ষোল সতেরো বছরের একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো গেটের কাছে। বললো, এসো। বাবা তোমাদের ডাকছে।

বললাম, কুকুরটা কামড়াবে না তো?

মেয়েটি হেসে বললে, ধ্যেৎ, ও কাউকে কামড়ায় না। খুব কথা শোনে।

মেয়েটির পিছু পিছু যেতে যেতে নজরুল চুপি চুপি বললো, ওরা সাহেব নয়, অন্য কোন জাত বলে মনে হয়।

—কে বললে?

—মেয়েটা কি রকম বাংলা বলছে—

—বাংলা শিখেছে।

নজরুল বললো, তাহলে ইংরেজি ভুলে গেছে।

হাতল-দেওয়া পুরোনো একটা ইজিচেয়ারে সাহেব বসেছিলো আমাদের জন্যে। তার দু'পাশে দুটো ছোট ছোট টুল পাতা রয়েছে। আমরা গিয়ে বসলাম।

কুকুরটা দূরে গিয়ে শুয়ে পিট্‌ পিট্‌ করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। সাহেবের প্রথম কথাই হলো—পয়সা এনেছো?

বললাম, ইয়েস টেক ইট।

পকেট থেকে দু'আনা পয়সা বের করে তার চেয়ারের হাতলের ওপর নামিয়ে দিয়ে বললাম, প্লিজ স্পিক্ ইন্ ইংলিশ।

হোয়াই? সাহেব হো হো করে হেসে উঠলো। ডাকতে লাগলো, মতি! মতি!

যে-মেয়েটি আমাদের ডেকে আনলো তারই নাম বোধহয় মতি।

মতি এসে দাঁড়াতেই সাহেব পরিস্কার বাংলায়·বললো, ভালো একটি পাকা পেঁপে কেটে দু'ভাগ করে দু'টি প্লেটে এদের দাও।

মতি বললো, মাকে বলবো, না আমি নিজেই দেবো, বাবা?

সাহেব জিগ্যেস করলো, তোমার মা কি করছে?

মতি তার বাবার কানে-কানে কি যেন বললো।

সাহেব চেঁচিয়ে উঠলো—সেই চোরটা আবার এসেছে?

বলতে বলতে লাঠিটা হাতে নিয়ে সাহেব উঠে বাড়ির ভেতর চলে গেলো। যাবার আগে আমার দেওয়া দু'আনা পয়সা কিন্তু নিয়ে যেতে ভুললো না। মতিও চলে গেলো তার পিছু পিছু। কুকুরটাও।

হঠাৎ বাড়ির ভেতর একটা গোলমাল উঠলো। মনে হলো সাহেব যেন লাঠি দিয়ে কাকে মারছে আর সে লোকটা চেঁচাচ্ছে।

নজরুল বললো, চলো পালাই।

—বা-রে, পয়সা দিলাম। পেঁপে খাবো না?

নজরুল বললো, আর-একদিন এসে খেয়ে যাবো।

উঠে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। এমন সময় তাড়া খেয়ে যে লোকটা ছুটতে ছুটতে আমাদের পায়ের কাছে এসে পড়লো, তাকে দেখেই আমরা চিনতে পারলাম। দুগ্‌গা। রানীগঞ্জ শহরের সবাই তাকে চেনে। সবাই বলে, দুগিয়া।

অস্বাভাবিক রকমের লম্বা আর কালো এই দুগিয়ার বয়স বোধ করি কুড়ি-বাইশের বেশি হবে না।

দুগিয়া অনায়াসে ছুটে পালিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু আমাদের একটা টুলে তাঁর পা লেগে সে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো। আগেও

যেমন দেখেছি সেদিনও তেমনি দেখলাম তার পরনে খাঁকি হাফপ্যান্ট, গায়ে লাল রঙের গেঞ্জি।

সাহেবও ছুটে এসেছে তার পিছু-পিছু। আবার এক ঘা মারবার জন্যে হাতের লাঠিটা সে তুলেছিলো, নজরুল হাত বাড়িয়ে সাহেবের হাতটা ধরে ফেললো, নইলে লাঠিটা পড়তো ছুগিয়ার মাথায়।

সাহেব বললো, ছাড়ো। ওকে আজ আমি খুন করে ফেলবো।

কালো রঙের রোগা ছিপছিপে একজন বর্ষীয়সী মহিলা এসে দাঁড়িয়েছিলো সাহেবের পেছনে। বললো, তা আবার খুন করবে না? ওই রোগা ছেলেটাকে মারতে তোমার হাত উঠছে?

সাহেব বললো, তুমি থামো। ও ব্যাটা চোর। ও আমার ঘড়ি চুরি করেছে।

মেয়েটি বললো, তুমি দেখেছো ওকে চুরি করতে?

—দেখলে ওকে আমি আস্ত রাখতাম! সবাই জানে, ও চোর। ও ছাড়া আর কেউ চুরি করেনি!

রানীগঞ্জের প্রতিটি মানুষ জানে, ছুগিয়া চোর। আমরাও জানি।

সাহেবের হাতটা নজরুল ছেড়ে দিয়েছিলো। বললো, ছুগিয়া পালিয়েছে। আপনি বসুন!

সাহেব কিন্তু বসলো না। দাঁড়িয়েই রইলো।

জিগ্যেস করলাম, কি রকম ঘড়ি আপনার?

সাহেব বললো, খুব ভালো পকেট ওয়াচ। তিরিশ বছর আছে ওটা আমার কাছে। একদিনের জন্যে বন্ধ হয়নি। এডেনে কিনেছিলাম। তখন আমার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বছর।

আমাদের বাড়ীর সুমুখে ঘড়ি মেরামতের একটি দোকান আছে। দোকানের মালিক জোসেফ। বাঙালী ক্রিশ্চান। ছুগিয়াকে প্রায়ই দেখি জোসেফের কাছে বসে বসে বিড়ি টানছে।

সাহেবকে বললাম, আমি একটা জায়গা জানি। দেখি যদি আপনার ঘড়িটা উদ্ধার করতে পারি।

সাহেব এতক্ষণে বসলো। বললো, দেখো যদি দু-একটা টাকা লাগে তো—

কথাটা তাকে শেষ করতে দিলো না সেই মেয়েটি। বললো, যা লাগে আমি দেবো। পাও যদি তো আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেয়ো।

সেদিন আর আমাদের পেঁপেও খাওয়া হলো না, ইংরেজি শেখাও হলো না। আর একদিন হবে বলে চলে এলাম সেখান থেকে।

জোসেফ মানুষটি বড়ো ভালো, সব সময়েই সাহেব সেজে থাকে। নেটিভ ক্রিশ্চান। গায়ের রংটি কিন্তু কয়লার মতো কালো।

সন্ধ্যার পর জোসেফ তার দোকান বন্ধ করে চলে যায়। সেদিন আর তাকে পাওয়া গেল না। পরের দিন সকালে দোকান খুলতেই জোসেফের কাছে গিয়ে বসলাম, চুপি চুপি জিগ্যেস করলাম, ডুগিয়া তোমাকে একটি ঘড়ি দিয়েছে?

জোসেফ তার আই-গ্লাসটি চোখ থেকে খুলে আমার দিকে তাকালো। জিগ্যেস করলো, কি রকম ঘড়ি?

বললাম, খুব ভালো পকেট-ঘড়ি।

জোসেফ একটু হাসলো, বললো ব্যাটার বাহাদুরি আছে। তোমাদের দোতলায় উঠলো কেমন করে?

ঘড়িটা যে আমাদের নয় সেকথা বললাম না জোসেফকে। চুপ করে রইলাম। জোসেফ বললো, দেড়টা টাকা নিয়ে এসো।

ছুটলাম শেকার সাহেবের বাংলোয়। টাকা এনে জোসেফের হাতে দিতেই জোসেফ ঘড়িটা বের করে আমার হাতে দিলো।

ঘড়ি পেয়ে মতির মায়ের সে কী আনন্দ! আমাকে ছাড়তে চায় না। বললো, কিছু খেয়ে যাও।

বললাম, এখন স্কুলে যেতে হবে। বিকেলে আসবো।

নজরুলের কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

নজরুল ইসলাম অনেক দিন থেকে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। এর দৈহিক ওজন আমাদের জানা আছে; আত্মিক, ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে।

জনগণ, ভদ্রসাধারণ এখনও ম'রে বেঁচে আছে; আসছে সার্বিক নিপট মৃত্যু এদের জন্যে—এবং তার ভিতর থেকেই আরো একবার বেঁচে ওঠবার অধ্যায়—জীবনকে নতুন ক'রে প্রতিপালন করবার প্রয়োজনে।

কিন্তু আমাদের সামাজিক জীবনে এই মৃত্যু ও জীবন যে যার কাছে দুরতিক্রম্য নয়। যতদূর ধারণা করতে পারি এই মানুষের পৃথিবীতে অনেক দিন থেকে এই রকমই চলেছে; একটা সময়বৈশিষ্ট্য ক্ষয়িত হয়ে নতুন সাময়িকতাকে নিয়ে আসে। এতে সমাজ কাজে উন্নত না হোক (বা হোক), মূল্যচেতনায় স্থিরতর হবার অবকাশ পায় ব'লেই তো মনে হয়। প্রবীণ বিরস মনীষীরা যাই ভাবুন না কেন, সাধারণের মানব-মন মনে করে যে ভোর আসছে। একেই কখনো বুদ্ধের, ধর্মাশোকের বা ফরাসী বিপ্লবোত্তর মানবীয় প্রাতঃকাল ব'লে মনে হয়েছে। সে-সব প্রাতঃকাল উন্মেষেই মিলিয়ে গিয়েছে বার-বার। ইতিহাসে দীর্ঘ সুদিন কোথায় পেলাম আমরা—এবং সুদীর্ঘ সুরাত্রি? কিন্তু তবুও আবারও ভোর আসছে।

এর থেকে নিরাশার মতামতে উপস্থিত হওয়া যায়, কিংবা জীব-বিজ্ঞানীর কাছ থেকে কথা জেনে নিয়ে এই মর্মে উপস্থিত হওয়া যায় যে মানুষ এখনও শিশু—তার সভ্যতার অন্তিম ক্ষণ এত দূরে যে আমাদের পক্ষে তা নেই; আমরা এসেছি কেবলমাত্র ভূমিকার ভাঙা-গড়ার ভিতর।

আমরাও তা-ই ভাবি। একটা যুগ ভেঙে যাচ্ছে দেখে আমাদের কারো-কারো সাহিত্যস্বভাব ভাঙনের লিপিরচনায় উদ্বেলিত হয়েও যা আজও পাওয়া যায় নি এমন কোনো নতুন সময়ের আভাসে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতে চায়; কিন্তু স্থিরতা পায় কি, অর্থসফলতা লাভ করে? ফলে আমাদের আগামী যুগের কবিতা হয় অত্যন্ত স্থুল হয়ে দাঁড়ায়; যে-সব নিয়মের প্রভাবে আগামীকাল ক্রমে-ক্রমে এসে পড়ছে তাদের ভিতর থেকে কয়েকটিকে প্রতীক বা প্রবর্তয়িতার মত চালিয়ে দিয়ে আমাদের কবিতা কি নবীন হয়ে ওঠে কিংবা কবিতা হয়? আর তা নয় তো বস্তুশক্তির দুরন্ত ক্রিয়াকৌশলের পরিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখেও একান্তভাবে ভাবনানিষ্ঠ হতে গিয়ে আধুনিক ও আগামীকালের কবিতা কারো-কারো হাতে এত বেশী তনু, সূক্ষ্ম হয়ে দাঁড়ায় যে আজকের কর্তব্যাসক্ত মানসের বিচারে সে-কবিতার শব্দ, ভাষা, ইঙ্গিত সমস্তই অসঙ্গত, আচ্ছন্ন ব'লে মনে হয়। এখনকার বাংলা কবিতায় এই দুটি স্বভাবই লক্ষিত হয়—প্রথমটি নিশান হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়েছে—নিজের বা অপরের মুখে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত দিব্য দিনের কিছু-না-কিছু স্বাদ পেয়েছে ব'লে। কিন্তু এই দুই প্রকৃতির মিশ্রণে ভালো কবিতা পেয়েছি—নিতান্ত কম নয়।

এ কালের বাংলা কবিতার এই সব অভিব্যক্তির আগে কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন। (তখন তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হ'ত)। আমাদের দেশে যে বিশেষ সময়রূপ অনেক দিন থেকে কাজ করে যাচ্ছিল, তেরোশো পঁচিশ—আটাশ--তিরিশে এক দিক থেকে যেমন তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছিল, অন্য দিকে, কয়েকটি ইতিহাসোত্থ কারণে এবং অঙ্গাঙ্গী নতুন সময়পর্ব তাকে উদ্বুদ্ধ করছিল ব'লে তা একটা আশ্চর্য রক্তচ্ছটায় রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল—যাকে মৃত্যুর বা অরুণের জীবনেরও ব'লে মনে করতে পারা যেত। নজরুলের অনেক কবিতাই সেই সময় লেখা হয়। মনের উৎসাহে লিখতে তিনি প্রলুব্ধও হয়েছিলেন; নিভে যাবার আগে বাংলার

সময়পর্যায় তখন বিশেষভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল ব'লে। এ-রকম পরিবেশে হয়তো শ্রেষ্ঠ কবিতা জন্মায় না, কিংবা এতেই জন্মায়, কিন্তু মননপ্রতিভা ও অনুশীলিত সুস্থিরতার প্রয়োজন। নজরুলের তা ছিল না। তাই তাঁর কবিতা চমৎকার, কিন্তু মানোত্তীর্ণ নয়। জনগণ তখন আজকের মত ঈষৎ উন্নীত—কিংবা রূপান্তরিত ?—ছিল না ; চমৎকার কবিতা চাচ্ছিল, (আজো জনমানস রকমফেরে তাই-ই চায় যদিও) ; নজরুল সেই মন স্পর্শ করতে পেরেছিলেন এমন ভাবে যে আজকের কারও কোনো জনসাধারণের জন্যে তৈরি কবিতা বা গদ্যকবিতা ফলত পদ্যের স্তরে নেমেও তা পেরেছে কিনা বলা কঠিন। তখনকার দিনে বাংলায় লোকোত্তর পুরুষ কম ছিলেন না—শ্মশানের পথে সন্তানোৎসব জমেছিল বেশ খানিকটা ঔদাস্যে। নজরুল ইসলামের আগ্রহ পুষ্ট হয়েছিল, তিনি অনেক সফল কবিতা উৎসারিত করতে পেরেছিলেন। কোনো-কোনো কবিতায় এত বেশী সফলতা যে কঠিন সমালোচকও বলতে পারেন যে নজরুলী সাধনা এইখানে-এইখানে সার্থক হয়েছে ;—কিন্তু তবুও মহৎ মান এড়িয়ে গিয়েছে।

কোনো এক যুগে মহৎ কবিতা বেশী লেখা হয় না। কিন্তু যে বিশেষ সময়ধর্ম, ব্যক্তিক আগ্রহ ও একান্ততার জন্যে নজরুলের অনেক কবিতা সফল ও কোনো-কোনো কবিতা সার্থক হয়েছিল—জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় মূল্য-ও-মাত্রাচেতনায় খানিকটা সুস্থির হয়েও আজকের দিনের অনেক কবিতাই যে সে তুলনায় ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে তা শুধু আধুনিক বিমুখ সময়রূপের জন্যেই নয়—আমাদের হৃদয়ও আমাদের বিরূপাচার করে, অনেক সময়ই আমাদের মনও আমাদের নিজেদের নয় ; এই সাময়িকতার নিয়মই হয়তো তাই। কিন্তু নজরুলের ব্যক্তিকতা ও সময় এই বুদ্ধিসর্বস্বতার হাত থেকে তাঁকে নিস্তার দিয়েছিল। আধুনিক অনেক কবিতা থেকে তাঁর কোনো-কোনো কবিতার অঙ্গীকার তাই বেশী, ধ্বনিময়তাও উৎকর্ণ না করে এমন

নয়। কিন্তু নিজেকে বিশোধিত ক'রে নেবার প্রতিভা নেই এ-সব কবিতার বিধানে, শেষরক্ষার কোনো সন্ধান নেই।

পরার্থপরতার চেয়ে স্বার্থসন্ধান ঢের হেয় জিনিস; স্বার্থসাধন কিছুই নয়, কিন্তু কবিমানসের আত্মোপকারপ্রতিভাই তাকে নির্মাতার ওপরের ভূমিকায় ওঠাতে সাহায্য করে, কবিতাকে তার অন্তিম সঙ্গতির পথে নিয়ে যায়। এরই স্বভাবে সৃষ্ট কবিতা যত দূর ব্যাপ্ত ও গভীর হয়ে উঠতে পারে নজরুল ইসলামের প্রথম ও শেষ কবিতা এরই অভাবে একই সূচনায় বিচ্ছিন্ন হয়ে তত দূর স্থান হারিয়ে ফেলছে।

আমার দেখা নজরুল

ব্রজবিহারী বর্ম্মণ

ছেলেবেলায় 'প্রভাত ফেরি'র গানে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠতাম আর ছুটতাম। গ্রামের তরুণদের কণ্ঠে 'জাগ জাগ ভারতবাসী…' গান শুনে অস্থিরভাবে আমরা বেরিয়ে পড়তাম, তাদের কণ্ঠে আমরা কণ্ঠ মিলিয়ে দিতাম। আরও একটু বড় হলে সভায় সমিতিতে 'সোনার বাংলা তোমায় ভালবাসি', 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক…', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে…' প্রভৃতি গান আমাদের প্রাণে দেশপ্রেমের জোয়ার বইয়ে দিতো। বিয়ের ব্যাণ্ড পার্টিতেও তখন 'কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি, জাগিয়া উঠুক মৃত প্রাণ' চলে। থিয়েটারে মুকুন্দ দাসের গান শুনি ঃ

'ভরসা মায়ের চরণতরী আমরা এবার হবোই পার।
ভয় গেছে দূরে পেয়েছি অভয়, মাভৈঃ বাণী শুনেছি মার।'

আর 'ডাকব কি শুনবে কিরে আছে কিরে কারো কান।
পাব কি এমন ছেলে দেশের লাগি কাঁদে প্রাণ।
দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে কত ভাবের গাইনু গান
সে গান শুনলে না কেউ
বুঝলে না কেউ কোন্ সুরেতে ধরছি তান…… '

স্কুলের পথে মেঠোপথে সহপাঠীদের কণ্ঠে বেজে উঠত ঃ

'বেত মেরে কি মা ভুলাবে আমরা কি মার সে ছেলে
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি কে পালাবে মা ফেলে।'

আর আমাদের শিরায় শিরায় কি রকম অভূতপূর্ব একটা শিহরণ অনুভব করি। হাটে মাঠেও স্বদেশী গান চলে। ক্রেতারা কেনাকাটা

ভুলে গান শুনতে ভিড় জমায়। এইরূপ পরিবেশের মধ্যেই আমাদের জীবন শুরু।

তারপর ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সভায় সমিতিতে স্বদেশী গানের প্লাবন বয়ে যায়। তবে গুপ্ত আন্দোলনের 'দাদারা' সভায় সভায় যেমন চরমপন্থী গান চালাতেন, তেমনি ভিতরে ভিতরে আমাদের 'নন্দকুমারের ফাঁসী', 'ঝাঁন্সীর রানী', 'দেশের কথা' পড়িয়ে পড়িয়ে চাঙ্গা রাখতেন আর বুঝিয়ে দিতেন—'অহিংসভাবে ইংরেজকে তাড়ান যাবে না, ওদের তাড়াতে হবে বন্দুকের গুঁতোয়।'

এই রকম পরিস্থিতির মধ্যেই গ্রাম ছেড়ে আমি কলকাতায় আসি। এতদিন কোন কবির কণ্ঠে তাঁর স্বরচিত গান শুনবার সুযোগ হয়নি। 'বিদ্রোহী কবি' কাজী নজরুলের গান কিছু কিছু নলিনদার (শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার) মুখে শুনেছি 'বিজলী' আপিসে আর ওল্ড ক্লাবে। '২২ সালের এক সন্ধ্যায় ওল্ড ক্লাবের এক বৈঠকে কবির মুখে তাঁর স্বরচিত গান শোনার সুযোগ পেলাম। প্রথমে তিনি তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন, তারপর গাইলেন স্বরচিত গান কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট।'

আজও সেদিনের স্মৃতি মনে পড়ে। কী উন্মাদনা সেই গানে! মনে হয় আমরাই কারার লৌহ কপাট ভেঙে ফেলতে যাচ্ছি—দেশের স্বাধীনতালাভের আর দেরি নেই। ইংরেজকে এবার পাড়ি জমাতে হবেই—সেদিনের আর বেশি দেরি নেই।

'২২ সালের দিকে ১নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট থেকে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ওপর আর্য পাবলিশিং হাউস স্থানান্তরিত হয়। সন্ধ্যার পর মার্কেটের বিরাট বারান্দায় আসর বসে। কবি নজরুল প্রায়ই এখানে আসতেন। কোনদিন 'বিদ্রোহী', কোনদিন 'কামাল পাশা' আবৃত্তি করতেন, কোনদিন বা হারমোনিয়াম সংযোগে চলত গান। কতবার এই আবৃত্তি শুনেছি, কতবার শুনেছি তাঁর মুখে গান কিন্তু আশা যেন

মিটত না! কতই না প্রেরণা পেতাম তাঁর গানে। মুকুন্দ দাসের অভিনয় আর গান শোনার সময়ও এমনি প্রেরণা পেয়েছি।

কংগ্রেস মহাসভা প্রতিষ্ঠার পূর্বাপর জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শকে কত কবি কত সুরে, ছন্দে রূপায়িত করার জন্য জাতীয় সঙ্গীত রচনা করে গেছেন। দেশের,এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্বদেশী যুগে এবং তারপর থেকে নানা আন্দোলনের মাধ্যমে তা জনগণের কণ্ঠে কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়েছে। জাতির জীবন-সমুদ্রের বুকে এই সব গান কত না সুরের তরঙ্গ তুলেছে—কালে কালে কতগুলো গানের মৃদু গুঞ্জন জীবন-সমুদ্রের কূলে কূলে প্রহত হয়ে থেমে গেছে আবার কতগুলো যুগ ও কালের প্রভাব অতিক্রম করে এখনও অব্যাহত আছে, পরেও অনেক কাল থাকবে। বিদেশী-রাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেও সভায় সমিতিতে তাই গান উঠেছে :

"বেত মেরে কি 'মা' ভুলাবে
আমি কি মার সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে ?"

স্বদেশী যুগের গান ও সংবাদপত্র (যুগান্তর, সন্ধ্যা প্রভৃতি) জাতির জীবনে এক জাগরণ আনয়ন করে। প্রতি ছত্রে দেশের প্রতি ভালবাসা আর ইংরেজ-বিদ্বেষ ছড়ান হতো। এইগুলোর প্রভাবে ধীরে ধীরে আমাদের মনের কোণেও ইংরেজ রাজত্বের প্রতি ঘৃণার বাষ্প উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

'২০ সালের দিকে বোমার যুগের বারীন ঘোষ মুক্তি পেয়ে 'বিজলী' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করে অহিংস অসহযোগে যে দেশের স্বাধীনতা আসবে না তা গরম গরম ভাষায় বলতে থাকেন। দু'এক বৎসরের মধ্যে তাঁরও সুর নরম হয়ে আসে। কবি নজরুল অনুভব করেন,

'বারীন্দ্র বরুণ আজি করুণ সুরে বংশী বাজায়'

তাই, তিনি 'ধূমকেতু' বার করেন। ধূমকেতুর জ্বালা-শিখা দাহন-বেদন এর প্রাণ। তরুণ বিদ্রোহীদের আবাহন গীতি, আগমন স্তুতি এর সুর। নাগশিশুর বিষ-বাষ্পের নীহারিকা-লোকের আভাস এর ছন্দে, সুরে, ভাষায়।

ধূমকেতুতে সেবার (১৯২৩) পূজোর সময় 'মায়ের আগমনী' নামক সুদীর্ঘ কবিতা বের হয়ঃ

'…আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ডেলার মূর্তি আড়াল।
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারীর শক্তি চাড়াল।…'

কবিতাটি পড়ে যেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠি তেমনি ভয় করতে থাকে কখন কবির কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হয় বিদেশী শাসকের অনুশাসনে। হলও তাই। কবিকে ধরা হল—এক বছর কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতও করা হল। কোর্টে কবি একটি বিবৃতি দিলেন, সেটি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে বিখ্যাত। রাজনৈতিক সাহিত্যে তা অক্ষয় অমর হয়ে আছে।

'২২ সালের আগে 'ব্যথার দান' নামক একখানা ছোট গল্পের বই বার হয়। '২২ সালে আর্য পাবলিশিং হাউস থেকে কবির সুবিখ্যাত বই 'অগ্নিবীণা' প্রথম বার হয়। বইখানা বার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। বিপিন পাল পর্যন্ত জাতির কবি বলে তাঁকে স্বীকার করে নেন। '২৪ সালের দিকে কবির প্রবন্ধের বই 'যুগবাণী' প্রকাশিত হয় এবং মাসখানেকের মধ্যেই 'বাজেয়াপ্ত' হয়ে যায়।

প্রেসিডেন্সী জেলে অবস্থানকালেই কবি তাঁর চতুর্থ বই 'দোলন-চাঁপা' রচনা করেন। জেল কর্তৃপক্ষের অগোচরে তার সবগুলো কবিতাই বাইরে পাচার করে দেওয়া হয়। পবিত্রদা' (শ্রীযুত পবিত্র গাঙ্গুলী) ওয়ার্ডারদের যোগাযোগে তা বার করে আনেন এবং কবির নির্দেশমত 'আর্য পাবলিশিং হাউসের' কর্মকর্তাদের হাতে প্রকাশ-ভার দেন। যথাসময়ে তা প্রকাশ করা হয়।

কবির কারাবাসের সুযোগে তাঁর মানসী-প্রিয়া তাঁকে অগ্রাহ্য করে অন্যের অঙ্কলক্ষ্মী হতে যাচ্ছেন এই পটভূমিকায় রচিত হয় 'দোলন-চাঁপা'।

১৯২৪ সালে আমার লেখা বাংলার প্রথম শহীদ 'ক্ষুদিরাম' বার হয়। এর আগে কবিকে বইখানার কথা জানালে তিনি আমাকে খুবই উৎসাহ দেন। বলতে গেলে একমাত্র তাঁরই উৎসাহে ও প্রেরণায় আমি বইখানা প্রকাশ করি। তিনি যথাসম্ভব সংশোধন করে দেন। বইখানা কবিকেই উৎসর্গ করা হয়।

ইতিপূর্বে কবির লেখা 'ভাঙার গান' ও 'বিষের বাঁশী' বাজেয়াপ্ত হয়। কবির কাছে আমি রাজনৈতিক কবিতার একখানা বই চাই প্রকাশ করার জন্য। তার বদলে তিনি আমাকে '২৫ সালে প্রকাশের জন্য 'ছায়ানট' বইখানা দেন এবং পরে রাজনীতি সংক্রান্ত বই দেওয়ার আশ্বাস দেন। আমিও সেই আশ্বাসে প্রেমের কবিতা সঙ্কলিত 'ছায়ানট' প্রকাশ করি। এখানে পঞ্চাশটি গীতি কবিতা ও গানের সমষ্টি। 'কবির বেদনা-সুন্দর প্রকাশোন্মুখ মূর্তি এর প্রতি কবিতায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে।'

'২৬ সালে 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা' (১৯২৭), 'সঞ্চিত', 'দু'দিনের যাত্রী' ও 'রুদ্রমঙ্গল' প্রকাশ করি।

১৯২৬ সালের ৭ই অক্টোবর। কৃষ্ণনগর থেকে সেদিন এক পত্রে তিনি একটি সুখবর জানানঃ স্নেহের ব্রজ; আজ সকাল ছয়টায় আমার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। তোমার বৌদি আপাততঃ ভাল আছে। আমিও আজ সকালে ফিরে এলাম যশোহর, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর বনগ্রাম প্রভৃতি ঘুরে।...

১৯২৬ সালের নভেম্বর। ঢাকায় ইলেকশন চলছে। কংগ্রেসের সহযোগিতার আশ্বাসে ঢাকা থেকে কাজীদা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ান। ২৯শে নভেম্বর ইলেকশনের ফলাফল বেরুবার কথা। কিন্তু তার ৫।৬ দিন পূর্বেই অর্থাৎ ২৩শে নভেম্বরই তিনি ঢাকা থেকে কৃষ্ণনগরে

ফিরে আসেন। তাঁর লেখা ২৫শে নভেম্বরের চিঠিতে ইলেকশনে কংগ্রেসের treachery সম্পর্কে আমাকে পত্র দেন।

স্নেহের বর্মণ, পরশু ঢাকা হতে ফিরেছি জ্বর নিয়ে। আজ বড্ড জ্বর এসেছে। Election-এর result out হবে ২৯শে নভেম্বর। হয়ত দেশে যেতে পারবো না ও সময়। তার করে খবর জানাবো। ঢাকা হতে শূন্য হাতে এসেছি। একটি পয়সাও নেই হাতে··· যদি পার একবার আসবে।····Congress আমায় কিছু help করেনি treachery করে। আমার বহু অর্থ দেনা হয়ে গেছে Election-এ, ভীষণ জ্বর, লিখতে পারছিনে। স্নেহাশীষ নাও। ইতি—

তোমার কাজীদা।

২০.১২.২৬ তারিখের চিঠিতেও জানা যায় কবি তখনো শয্যাগত। তিনি লিখেছেন, বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি রোগের ও অন্যান্য চিন্তার জ্বালায়। চিন্তার মধ্যে অর্থ-চিন্তাটাই সবচেয়ে বড়। কী করে যে দিন যাচ্ছে ভগবান জানেন। তোমার প্রেরিত টাকা পেয়েছি, তুমি ছোট ভাইএর মত, তোমাকে বেশি কি লিখব। তোমার অন্যান্য খবর দিও।

২০ ৪.২৬ তারিখের একখানা পত্র ঃ

আমি বড় বিপদে পড়েছি। প্রায় প্রত্যহ slow fever হচ্ছে। বহু দেনা করেছি, আর টাকা পাওয়া যাবে না ধার এখানে।··

১১.৫.২৭ তারিখের একখানি পত্র ঃ

স্নেহভাজনেষু, ব্রজ, আগামী পরশু রবিবার রাত্তিরে আমার খোকার (বুলবুলের) মুখে ভাত দেওয়া উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ করেছি। কলকাতা ও স্থানীয় অনেক বন্ধুবান্ধব আসবেন। তুমি সেদিন অবশ্য এসো। না এলে দুঃখিত হব। হয় সকালের চট্টগ্রাম মেলে—কিংবা দুপুর ১টা ৩৫ মিনিটের সময়···মুর্শিদাবাদ

প্যাসেঞ্জারে আসবে। এ দুটি ছাড়া আর ট্রেন নেই।...এলে অন্যান্য কথা হবে।...স্নেহাশীষ নাও। ইতি—

শুভার্থী—

নজরুল।

রেবতী বর্মণ প্রতিষ্ঠিত 'বেণু' (কিশোরদের জন্য মাসিক পত্র) প্রথম বার হয় আমার বর্মণ পাবলিশিং হাউস থেকে—কয়েক সংখ্যা ওখান থেকেই বার হয়। পরে রাজনৈতিক কারণে তিনি তা বৈঠকখানা থেকে বার করতে থাকেন। শ্রীযুত সতীকান্ত গুহ মহাশয় তার সম্পাদক ছিলেন। এই সময়ে তিনিও পদত্যাগ করেন। প্রধানত তাঁরই উৎসাহে আমি ১৩৩৫ সালের পৌষ মাসে 'চিত্রা' (কিশোরদের মাসিক) বার করি। শ্রীযুত সতীকান্ত গুহ এবং শ্রীযুত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। কাজীদার সঙ্গে পরামর্শ করায় তিনি খুব উৎসাহ দেন এবং 'কিশোর' নামে একটি কবিতা দেন। ১ম সংখ্যা পৌষ মাসে তা বার হয়। পরে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়ও 'শিশু যাদুকর' নামে আরেকটি কবিতা বার হয়। এই দু'টি কবিতা কোন বইয়ে বার হয়েছে বলে জানি না। তাই এখানে ঐ দুটি কবিতা উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

॥ কিশোর ॥

ওরে ও কিশোর-প্রাণ!
কোন্ যৌবন-রঙ্গীন্ দেশে আজি তোর অভিযান?
ঘনাইল চোখে কিসের স্বপন
অলখ-লোকের ইশারা গোপন
নেহারি' কখন, বাহিরিলি পথে, শুনি কার আহ্বান?
ওরে ও কিশোর প্রাণ!

ওরে ও ঝর্নাধারা !
কোন্ সাগরের ডাক শুনি' আজ ভাঙিলি পাষাণ-কারা ?
উপলে নুড়িতে চপল দু-পায়ে
উর্মি ছন্দে নূপুর বাজায়ে
নদ নদী পথ অনুসরি' যাস ছুটিয়া বাঁধন-হারা,
ওরে ও ঝর্নাধারা !

ওরে ও উষার লালী !
তোরি রঙে ঐ রাঙিয়া উঠিল গভীর রাতের কালি ।
জানালি খবর তরুণ আশার
অনাগত নব অরুণ আসার,
ঘুম্-ঘরে তুই বাজাইলি তোর বিহগের করতালি ।
ওরে ও উষার-লালী !

ওরে ও অফুট কুঁড়ি ।
কুসুম-গন্ধ রেখেছে বনানী তোরি সে তবকে মুড়ি' ।
তোরি তরে ভাই—জানি মোরা জানি
ভ্রমরে কাননে এত কানাকানি,
তোরি তরে বধূ সাজি আনে, জাগে দেবতা দেউল জুড়ি !
ওরে ও অফুট কুঁড়ি

কলিকাতা, নজরুল ইসলাম
১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ —'চিত্রা' (পৌষ—১৩৩৫)

চিত্রায় ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বার হয় ঃ

॥ শিশু যাদুকর ॥

পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর ;

কোন্ রূপ-লোকে ছিলি রূপ-কথা তুই
রূপ ধরে এলি এই মমতার ভুঁই।
নবনীত—সুকোমল লাবণী লয়ে
এলি কে রে অবনীতে দিগ্‌বিজয়ে।
কত সে তিমির-নদী পারায়ে এলি—
নির্মল নভে তুই চাঁদ পাইলি।
অমরার প্রজাপতি অন্য মনে
উড়ে এলি দূর কান্তার কাননে।
পাখা ভরা মাথা তোর ফুল ধরা ফাঁদ,
ঠোঁটে আলো চোখে কালো—কলঙ্কী চাঁদ!
কালো দিয়ে করি তোর আলো উজ্জ্বল—
কপালেতে টিপ দিয়ে নয়নে কাজল।

তারা-যুঁই এই ভুঁই আসিলি যবে
একটি তারা কি কম পড়িল নভে?
বনে কি পড়িল কম একটি কুসুম?
ধরণীর কোলে এলি একরাশ চুম।

স্বরগের সব কিছু চুরি করে; চোর,
পলাইয়া এলি এই পৃথিবীর ক্রোড়!
নিয়ে এলি পরীদের তুলতুলে গাল,
পরীদের রাঙা ঠোঁট টুক্‌টুকে লাল।
কিন্নরী কণ্ঠ ও 'নার্গিসী' চোখ,
ললাটেতে প্রভাতের ঊষার আলোক,
চিবুকের টোলে ভরে সুধা অমিয়া,
মন্মথ-ফুলধনু ভুরুতে নিয়া।

চোখে ফিরদৌসের 'লাল' 'ইয়াকুত'।
তোরে, চোর, খুঁজে ফেরে আসমানী দূত!
তোরে হেরি বেহেশেতে কাঁদে ইউসুফ,
তোর হাসি শুনে বনে বুলবুলি চুপ।
ছোট তোর মুঠি ভরি আনিলি মণি—
সোনার জিয়ন কাঠি মায়ার ননী!
তোর সাথে ঘর ভরে এল ফাল্গুন,
সব হেসে খুন হল, কি জানিস গুণ!
এল কুসুমের বাস পাখীদের গান,
ভিড় করে আলো এল, বুক ভরা প্রাণ।
পেলি হেথা ঠোঁট ভরা মধু চুম্বন,
আমি দিনু হাতে তোর নামের কাঁকণ!
তোর নামে রহিল রে মোর স্মৃতিটুক্।
তোর মাঝে রহিলাম আমি জাগরুক।

'চিত্রা' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ —নজরুল ইসলাম।

১৯৩০ সালে কাজী নজরুল ইসলামের 'প্রলয় শিখা' নামে একটি কবিতার বই প্রকাশ করি। ইচ্ছাকৃতভাবেই, গরম গরম কবিতা তাতে রাখা হয়। 'রাজদ্রোহে'র ভয়ে যেসব কবিতা পূর্বে কোন বইয়ে দেওয়া হয়নি সেগুলো এবং কয়েকটি নয়া কবিতাও এতে সংযোজিত হয়। বর্তমান প্রকাশিত বইয়ে সেগুলোর সব নেই।

বইখানার জন্য সরকার কবির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহকর মামলা আনয়ন করেন। ইতিপূর্বে 'ফাঁসীর আশীর্বাদের' জন্য আমার ২ বৎসরের জেল হয়। এজন্য আমাকে এই মামলায় আর জড়ানো হয় না। কাজীদার ছ'মাসের জেল হয় কিন্তু ৩১ সালের Amnesty-র সুযোগে তাঁকে আর জেল-বাস করতে হয় না।

বৎসর-দুই জেল-বাসের পর ১৯৩১ সালের শেষদিকে জেল থেকে আমি মুক্তি পাই। তার কিছুদিন পরেই আবার ধৃত হই অস্ত্র-আইন এবং বার্জ-হত্যা অভিযোগে। এসব অভিযোগ ব্যর্থ হওয়ায় আমাকে আটক আইনে নানা বন্দিনিবাসে রাখা হয়। ১৯৩৭ সালের শেষে সকল রাজবন্দীর সঙ্গে মুক্ত হই। মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের অসুখে ভুগতে থাকি এবং শেষ পর্যন্ত আমার ডান পা-খানি কেটে ফেলতে হয়।

সুদীর্ঘ জেলভোগ এবং পায়ের অসুখের দরুণ কাজীদার সঙ্গে সুদীর্ঘকাল আর দেখা-সাক্ষাৎ নাই। আমার এই অঙ্গচ্ছেদ অবস্থার দৃশ্য কবির মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে এই ভয়ে ভরসা পাই না তাঁর সঙ্গে দেখা করার।

কবি নিরাময় হয়ে উঠুন এই কামনা।

নজরুল প্রসঙ্গে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিনই দু'চার কলম জোড়া শিরোনামা ছাপবার মতো উত্তেজনা জাগানো চমকদার খবর থাকে।

সাহিত্যের জগতে এ ধরনের খবর কিন্তু একান্ত বিরল।

হঠাৎ ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস কি দুরন্ত তুফানের মত ব্যাপার সেখানে দেখা যায় না বললেই হয়। বাংলা সাহিত্যে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ায় একবার কিন্তু এমনি অকস্মাৎ তুফানের দুরন্ত দোলা লেগেছিল। সে দোলা যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সেদিন অনুভব করেন নি তাঁদের পক্ষে শুধু লিখিত বিবরণ পড়ে সে অভিজ্ঞতার যথার্থ স্বাদ পাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। বাংলা সাহিত্যে তার কমবেশী এক দশক আগে সচকিত বিস্ময় জাগিয়ে শরৎচন্দ্র অবশ্য হঠাৎ দূর অজানার রহস্যমণ্ডিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দশকের বিস্ময় চমক কিন্তু একটু অন্য ধরনের! শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাঁর কাহিনী হঠাৎ যতটা মুগ্ধ করেছিল কাহিনীকারের রহস্য পরিচয় কৌতূহলী করে তুলেছিল ততখানিই! তাছাড়া শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব কাহিনীকার হিসেবে গদ্য সাহিত্যে আর এ আলোড়ন উঠেছিল কাব্যের জগতে। না, শুধু কাব্যের জগতে বললে ভুল হবে, এ আলোড়ন উঠেছিল কাব্যের ধারা বেয়ে সে যুগের যৌবন মানসে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার তখন মধ্যাহ্ন দীপ্তি। দেশের যুবজনের মনে তাঁর আসনও পাকা। তারই মধ্যে হঠাৎ আর একটা তীব্র প্রবল তুফানের ঝাপটা কাব্যের রূপ নিয়ে তরুণ মনকে উদ্বেল করে তুলেছিল—

আমি ঝঞ্ঝা আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি!

কবিতার ছন্দে ও ভাষায় এ কি উত্তাল তরঙ্গ! কার কণ্ঠে ধ্বনিত এ প্রচণ্ড কল্লোল? কিশোর জগতে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল, জেগে উঠেছিল একটা রোমাঞ্চিত শিহরণ।

মনে আছে বন্ধুবর কবি অচিন্ত্যকুমার একটি কাগজ কোথা থেকে কিনে নিয়ে অস্থির উত্তেজনার সঙ্গে আমার ঘরে এসে ঢুকেছিলেন।

কাগজটা সামনে মেলে ধরে বলেছিলেন, পড়। অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি। রাস্তায় কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে এ কাগজ নিয়ে।

কি সে এমন কাগজ? নেহাত সাধারণভাবে ছাপা, যত দূর মনে পড়ছে ডবল ডিমাই সাইজ-এর সাপ্তাহিক কাগজ। পাতাগুলো আলগা, সেলাই করাও নয়। দাম বোধ হয় চার পয়সা। সেই কাগজ কেনবার জন্যে সারা শহর ক্ষেপে গেছে! কেন?

কেন, তা আমি তখন একেবারে জানি না, এমন নয়। খবরটা আমার কানেও পৌঁছেছে। অন্য একটা মাসিক কাগজ থেকে একটি দীর্ঘ কবিতা এই সাপ্তাহিকটিতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তখনও কাগজটা চোখে দেখিনি, লেখাটাও পড়া হয়নি।

তখন পড়লাম,

বল বীর
বল উন্নত মম শির,
শির নেহারি আমার
নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির!

পড়লাম, কবিতার নাম—বিদ্রোহী। এ আবার কি রকম বিদ্রোহী?

বল বীর
আমি চির উন্নত শির।
আমি দুর্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার।
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যত বন্ধন
যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।

সেদিন ঘরে-বাইরে, মাঠে-ঘাটে-রাজপথে-সভায় এ কবিতা নীরবে নয়, উচ্চকণ্ঠে শত শত পাঠক পড়েছে। সে উত্তেজনা দেখে মনে হয়েছে যে, কবিতার জ্বলন্ত দীপ্তি এমন তীব্র যে, ছাপার অক্ষরেই যেন কাগজে আগুন ধরিয়ে দেবে।

আমি পিনাক পানির ডমরু ত্রিশূল
ধর্মরাজের দণ্ড
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ,
আমি প্রণব নাদ প্রচণ্ড
আমি ক্ষ্যাপা দূর্বাসা বিশ্বামিত্র শিষ্য
আমি দাবানল দাহ দাহন করির বিশ্ব।

গাইবার গান নয়, চীৎকার করে পড়বার এমন কবিতা এ দেশের তরুণেরা যেন এই প্রথম হাতে পেয়েছিল। তাদের উদ্দাম হৃদয়ের অস্থিরতারই এ যেন আশ্চর্য প্রতিধ্বনি।

মহা বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হ'ব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেইদিন হ'ব শান্ত।
আমি চির বিদ্রোহী বীর
আমি বিশ্ব ছড়ায়ে উঠিয়াছি একা
চির উন্নত শির।

এ কবিতা সেদিন বাংলা দেশকে যে মাতিয়ে দেবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে! কবিতার নাম বিদ্রোহী—সে বিদ্রোহের স্বরূপ অবশ্য অস্পষ্ট, ঝাপসা।

আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির দুর্জয়!

আবার—

আমি গোপন পিয়ার চকিত চাহনি
ছল করে দেখা অনুখন
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা
তার কাঁকন চুড়ির কনকন—

হয়ে—সব কিছু বেশ গুলিয়ে দেয়। তবু ঘোলাটে উচ্ছ্বাসে ফেনিয়ে ওঠা এ কাব্যের সন্ধ্যা-ভাষার অন্তরালে কোন বিদ্রোহের তূরী ভের যে কবি বাজিয়েছেন তা বুঝতে সেদিনকার তরুণদের দেরী হয়নি।

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না…

শুধু সেদিন সে শান্ত হবে—সেই বিদ্রোহী কবিকে সমস্ত বাংলা দেশ সোৎসাহে বিজয়মাল্য দিয়েছে।

বিদ্রোহী কবিতা লিখে কাজী নজরুল ইসলাম একদিন বাংলা-দেশের তরুণদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন বলা যায়।

সেদিন সে কবিতার প্রচণ্ড আলোড়ন জাগাবার শক্তি লক্ষ্য করেছি, লক্ষ্য করেছি তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া শুধু তখনকার কবিযশোপ্রার্থী তরুণদের ওপরই নয় স্বয়ং বিদ্রোহী কবিতার রচয়িতা নজরুল ইসলামের ওপরেও।

বিদ্রোহী কবিতায় যে আস্ফালিত লেখনী কবি ব্যবহার করেছিলেন তা যেন তাঁর পক্ষে থামানো শক্ত হয়ে উঠেছে এর পর। উগ্র উদ্দাম কবিতার পর কবিতা লিখে তিনি তাঁর ক্রমবর্ধমান ভক্ত পাঠক-সমাজকে উত্তেজিত, মুগ্ধ করে রেখেছেন।

সে যুগে এ ধরনের উত্তপ্ত লাভাস্রোতের মত কবিতার প্রয়োজন সত্যিই ছিল। শুধু পরাধীনতা নয়, তার আনুষঙ্গিক হীনমন্যতা থেকে মুক্তি তখন দরকার। কবির 'বলো বীর বলো উন্নত মম শির'

সেই হীনমন্যতারই প্রতিষেধকের কাজ করেছে। সেই সঙ্গে ইন্ধন যুগিয়েছে পরম রাজনীতিরও।

এসব কথা স্বীকার করার পরও মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি কিন্তু থেকে যায়। আমার সেদিন গিয়েছিল সে অস্বস্তি এই কারণে যে, 'বিদ্রোহী' বা সে যুগের ওই সুরের কবিতার স্থূল প্রভাব ও প্রচার-মূল্য যত বেশীই হয়ে থাক কবি হিসেবে নজরুল ইসলাম তাই দিয়েই পাছে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। নজরুল ইসলামকে সেভাবে চিহ্নিত করা তাঁর প্রতিভার প্রতি সুবিচার নয়।

সে অবিচার যে একেবারে হয়নি এমন কথা জোর করে বলতে পারছি কই! নজরুল ইসলাম-এর নির্বাচিত কবিতার একটি সংকলন দেখে সেই ধারণারই কিছুটা সমর্থন পাচ্ছি।

নজরুল ইসলাম অবশ্য গজদন্তমিনারে স্বেচ্ছানির্বাসিত নিরক্ত মানসিক পাণ্ডুরোগী শৌখীন কবি নন। তিনি জনতার মাঝখানে সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন। ভাষায় চেষ্টাকৃত দুর্বোধ্যতা দিয়ে তিনি নিজের চারিধারে কৃত্রিম আভিজাত্যের বেড়া বাঁধবার হাস্যকর চেষ্টা করেন নি। বিদেশী বা দেশী কোনো সস্তা নকল হুজুগের ভেক তিনি নেন নি পণ্ডিতম্মন্যদের কাগুজে বাহবা কুড়িয়ে অক্ষমের ঘোট পাকাবার জন্যে। তিনি শোনাবার জন্যে, বোঝাবার জন্যে কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন তাতাবার জন্যে, মাতাবার জন্যে, মন জুড়িয়ে দেবার জন্যে।

দেশ বা সমাজ-চেতনার ধার-না-ধারা, সুবিধা ও স্বার্থের খাতিরে অকাতরে যে কোন নিলামদারের কাছে নিজেদের বেচে দেওয়া, ধার-করা বৈদগ্ধ্যের ফাঁকা বুকনি-ঝাড়া আত্মসর্বস্ব কিছু সাজা-কবি সব দেশে সব যুগে-ই বোধ হয় থাকে। আমাদের দেশে ও কালেও তা ছিল ও আছে।

সামাজিক ও মানবিক বিবেক তাঁদের মত অসাড় না হলে কবিতার

নামে শুধু মড়ার মুখে আলপনা আঁকার মত ছন্দ মিল আর ভাষার ফাঁকির কারিকুরি দেখিয়ে খুশি থাকা যায় না।

নজরুল ইসলামের মানবিকতা গভীর, অকপট। তাঁর সামাজিক বিবেক তীক্ষ্ণ ও সদাজাগ্রত। কাব্যে তাই তথাকথিত বিশুদ্ধতা থেকে ঘৃণাভরেই তিনি দূরে সরে থেকেছেন। কাব্যের মেকী আভিজাত্যের পরোয়া না করে অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে লেখনী বার বার, তাঁর কণ্ঠ গর্জে উঠেছে সব নীচতা সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে।

এ দুর্ভাগা দেশের অনেক গ্লানির মধ্যে সব চেয়ে যা তাঁকে পীড়িত করেছে তা হল এ দেশের মানুষের অন্ধ গোঁড়ামি আর সাম্প্রদায়িকতা। কখনো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে, কখনো তীব্র ধিক্কারে বারবার এই মানসিকতার বিরুদ্ধে তিনি আঘাত হেনেছেন, গড়ে তুলতে চেয়েছেন সব তুচ্ছ মিথ্যা ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে এক অখণ্ড মানবতা।

নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি, সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

নগর সভায় কি রাজপথে নজরুল ইসলাম শুধু এ ধরনের কবিতাই উচ্চকণ্ঠে আমাদের শোনান নি, নিভৃত অবসরে মর্মের মাঝখানে পৌঁছে দেবার মত মৃদু মধুর স্বরও তাঁর কণ্ঠে বহুবার আমরা শুনেছি।

তাঁর উচ্চকণ্ঠের বলিষ্ঠ উচ্চারণ সে অন্তরঙ্গ সুরের আলাপ একেবারে চাপা দিক, তা আমরা যেমন চাই না, তেমনি এ কৃতঘ্ন দেশ থেকে তাঁর চারণ কণ্ঠের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্যও নয়।

বিদ্রোহী কবি

মন্মথ রায়

॥ ১ ॥

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণদল
চল্ রে চল্ রে চল্।
চল্ চল্ চল্ ॥
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব-নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

জাতিকে নবজীবনের এই গান শুনিয়েছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

যদিও তিনি আজ আমাদের মধ্যেই রয়েছেন তবু দেশের চরম দুর্ভাগ্য যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আজ তাঁর কলম আর চলে না—গানও গেছে থেমে। বাঙালী তাঁকে কোনো দিনই ভুলবে না। পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমায় চুরুলিয়া গ্রামে কবি নজরুল ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। নদীর সরসতা এবং পাহাড়ের কঠোরতা চুরুলিয়ার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। জন্মভূমির এই

বৈশিষ্ট্য কবির চরিত্র ও রচনাতে প্রতিভাত হয়েছিল। কবির মাতার নাম জাহেদা খাতুন। পিতার নাম ফকির আহম্মদ। কবি বাল্যকালেই পিতৃহীন হন। শৈশবের দুঃখ-দারিদ্র্যে আর স্নেহ-মমতার অভাবে তাঁর ভেতরে বাল্যে যে বিদ্রোহ ভাব সৃষ্টি হয়েছিল তারই সুর বেজেছে তাঁর পরবর্তী জীবনে আর সাহিত্যে। এই সেই গৃহ যেখানে কবি প্রথম ধরণীর আলো দেখেছিলেন। দশ বছর বয়সে নজরুল গ্রামের এই মক্তব থেকেই নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেন। পাশেই নরোত্তম সিংহের গড়। কাছেই পীরপুকুরের পাড়ে ছোট একটি মসজিদে খাদেমও ছিলেন তিনি কিছুদিন। এগার বছর বয়সেই নজরুল লেটো গানের দলে ভিড়ে পড়েন। পরে তাঁকে সিয়ারসোল রাজস্কুলে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়।

১৯১৭-র বিশ্বযুদ্ধে ৪৯ নম্বর বাংলা রেজিমেণ্টের মৃত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ। স্কুল পালিয়ে ঐ রেজিমেণ্টে নজরুলও যোগ দেন; চলে যান করাচী। নজরুলের সৈনিক-জীবন করাচীতেই কাটে। হাবিলদার হয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধের পর বাঙালী রেজিমেণ্ট ভেঙে দেওয়া হয়। দেশে ফিরে আসেন নজরুল। কলকাতায় এসে উঠলেন ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে—মোসলেম ভারত ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কার্যালয়ে। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকাতেই নিয়মিতভাবে লেখা শুরু করেন নজরুল। 'বিজলী' ও 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয় তার যুগান্তকারী কবিতা—'বিদ্রোহী'।

বল বীর,
চির-উন্নত মম শির,
শির নেহারি আমারি নতশির ওই
শিখর হিমাদ্রির!

১৯২২ সালে তিনি 'ধূমকেতু' সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী পাঠালেন—

আয় চ'লে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নি সেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন!
অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভাল হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

আপিস হ্‌ল ৭নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেনে—যে লেনে একদা বাস করতেন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের উদ্‌গাতা—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। দেশের যুবশক্তিকে বিদেশী-শাসনে লাঞ্ছিত দেখে শারদীয়া সংখ্যা 'ধূমকেতু'তে মায়ের কাছে অনুযোগ করলেন তার এই "দামাল" ছেলে—

আর কত কাল রইবি বেটি
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি—চাঁড়াল!
দেবশিশুদের মারছে চাবুক,
বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা
আসবি কখন সর্বনাশি!

বৃটিশ শাসন বরদাস্ত করতে পারলে না এই কবিতা। কবি হলেন গ্রেপ্তার। ১৯২৩ সালে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটের পুলিশ কোর্টে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত কবি যে জবানবন্দী দিলেন তা চিরকালের সাহিত্য।

"রাজার পক্ষে রাজার নিযুক্ত রাজ-বেতন-ভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে—সকল রাজার রাজা সকল বিচারকের বিচারক আদি অন্তকাল ধরে সত্য-জাগ্রত—ভগবান্।"

ঐ অত্যাচারীর সত্যপীড়ন
আছে তার আছে ক্ষয়
সেই সত্য আমার ভাগ্য বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।

বিচারে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল কবির। কবিকে প্রথমে রাখা হয় আলিপুর সেনট্রাল জেলে। ইতিমধ্যে তাঁর 'অগ্নিবীণা' বেরিয়েছে। প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'অগ্নিবীণা'ও দেশের মধ্যে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য আনলে। কবির কণ্ঠে যেন কাল-ভৈরবের প্রলয়তূর্য বেজে উঠল। আলিপুরের এই সেলে অবরুদ্ধ কবি দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। এই ফাঁসির মঞ্চ দেখেই বুঝিবা কবি পরবর্তী কালে লিখেছিলেন—

ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয় গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা
দিবে কোন বলিদান!
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা
জাতেরে করিবে ত্রাণ।
দুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল
কাণ্ডারী হুঁসিয়ার,
দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে
যাত্রিরা হুঁসিয়ার।

তৎকালীন কারাগারের অব্যবস্থার প্রতিবাদে কবি অনশন করলেন। তিনি গাইলেন –

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর্ রে লোপাট

রক্তজমাট
শিকল পূজোর পাষাণ বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি'।

এই সেল-এ হাতে কড়া, পায়ে বেড়ী দিয়ে কবিকে বন্দী করে রাখা হল; কবির অনশনের সংবাদে সারা দেশ হল বিচলিত, বিক্ষুব্ধ। শিলং থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী কবিকে টেলিগ্রাম করলেন—

'Give up hunger strike, our literature claims you'.

কলকাতায় এক বিরাট জনসভায় জেল-কর্তৃপক্ষের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। কবিকে অনশন ত্যাগের জন্যে দেশবাসীর তরফ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। সরকার বন্দীদের দাবী মানবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় কবি চল্লিশ দিনের দিন উপবাস ভঙ্গ করেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে তাঁর 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গ করে তাঁকে ধন্য করেন। হুগলী জেল থেকে বহরমপুর জেলে নজরুলকে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানেও চলেছে কবির সাহিত্য-সংগীত সাধনা। কারাগারে যে-সব গান তিনি মুখে-মুখে রচনা করেছিলেন বাইরেও তার আগুন তখন ছড়িয়ে পড়েছে।

এই শিকল পরা ছল্
মোদের এ শিকল পরা ছল্—
এই শিকল পরেই শিকল তোদের কর্‌ব রে বিকল।
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।
এই শিকল বাঁধা পা নয় এ শিকল ভাঙা কল,

তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনিতে করছ বিশ্ব গ্রাস
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাব্‌ছ বিধির শক্তি হ্রাস !
সেই ভয় দেখানো-ভূতের মোরা করব সর্বনাশ
এবার আন্‌ব মাভৈ বিজয়মন্ত্র বলহীনের বল
তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটি ধর্‌ব টিপে কর্‌ব তারে লয়।
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব পরাভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আন্‌ব হাসি মৃত্যু জয়ের ফল।

॥ ২ ॥

এই সময় কবির "দোলন চাঁপা" প্রকাশিত হয়। মেয়াদের এক মাস আগেই কারামুক্ত হন নজরুল। কারামুক্ত কবি বন্দী হলেন এবার ৬নং হাজী লেনে, প্রমীলা সেনগুপ্তার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে। এই সময় তাঁর "বিষের বাঁশী" ও "ভাঙার গান" প্রকাশিত হয়েই বাজেয়াপ্ত হয়। এর পর কবি সপরিবারে হুগলীতে গিয়ে বাসা বাঁধেন। তখন তাঁর দারুণ অর্থকষ্ট। অনেকদিন অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটাতে হয়েছে তাঁকে। ১৯২৫ সালে শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র "লাঙল" প্রকাশিত হয়। এর প্রধান পরিচালক ছিলেন কবি।

প্রথম সংখ্যায় প্রসিদ্ধ সাম্যবাদী কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সাম্যবাদীর প্রধান সুর মানবিকতা। ১৯২৭ সালে লাঙলের নবরূপ হয় 'গণবাণী'।

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী।
অ-লিখিত যত গল্প কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি ॥
শক্তিময়ী সে এক জননীর
স্নেহ-সুত সব তোরা যে রে বীর,
পরস্পরের আশা যে রে তোরা মা'র সন্তাপহারী ॥

১৩৩৬-এর ২৯শে অগ্রহায়ণে Albert Hall-এ জাতির পক্ষ

থেকে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। পৌরোহিত্য করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কবি সেদিন বলেছিলেন, "যে কুলে, যে সমাজে, যে বর্ণে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।" ছন্দের খেলা তাঁর মনকে টেনে নিয়ে যায় সুরের রাজ্যে। এইচ. এম. ভি. প্রমুখ গ্রামোফোন কোম্পানী-গুলিতে রেকর্ড হতে থাকে তাঁর গান। গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডিং রুম! কবি নিযুক্ত হন এইচ. এম. ভি.-র ট্রেনার। নজরুলের কবি-প্রতিভা সার্থকতা লাভ করেছে গানে। ভাবের ব্যঞ্জনায় ও সুরের বিশেষত্বে নজরুল-গীতি সুবিখ্যাত।

আমার শ্যামা মায়ের কোলে চ'ড়ে
জপি আমি শ্যামের নাম,
মা হলেন মোর মন্ত্র গুরু
ঠাকুর হলেন রাধা-শ্যাম।

অতঃপর কলকাতার বেতার কেন্দ্রও গান-রচনা ও সুর-সংযোজনার প্রয়োজনে তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যান।

নীলাম্বরী শাড়ী পরে
নীল যমুনায় কে যায় কে যায় কে যায়,
যেন জলে চলে স্থলো কমলিনী
ভ্রমর নূপুর হয়ে ঘোরে পায় পায়।

কবি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও কয়েকখানি উপন্যাস এবং নাটকও লিখেছেন। তাঁর 'আলেয়া' নাটকটি নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয়। তাঁর সর্বশেষ নাট্য রচনা 'মধুমালা' গীতিনাট্য নাট্যভারতীতে অভিনীত হয়। নাট্যকার বন্ধুদেরও মহুয়া, কারাগার, রক্তকমল প্রভৃতি বহু নাটকে গান রচনা করে দিয়েছিলেন তিনি। ছায়াচিত্রের সংগীত রচনাতেও তাঁর দান কম নয়। কবি তাঁর কাব্য-সংকলন 'সঞ্চিতা' উৎসর্গ করেন কবিগুরুকে। কিন্তু মধ্যাহ্ন-সূর্যের এই দীপ্তি মেঘাচ্ছন্ন হল। এক দুর্জ্ঞেয়, দুরারোগ্য ব্যাধিতে কবি আক্রান্ত

হলেন। আরো দুর্ভাগ্য যে কবিপত্নী দুরন্ত পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁদের দুটি শিশু-সন্তানও অকালে ইহলোক ত্যাগ করে। পক্ষাঘাতে অক্ষম—তবুও স্বামীকে নিজহাতে খাওয়ানোটি চাই!—কী অসহায় আজ এই দম্পতি!

বিদায়, হে মোর বাতায়ন পাশে
নিশীথ জাগার সাথী!
ওগো বন্ধুরা পাণ্ডুর হয়ে
এলো বিদায়ের রাতি।
আজ হতে হল বন্ধ আমার
জানালার ঝিলিমিলি
আজ হতে হল বন্ধ মোদের
আলাপন নিরিবিলি।

কলকাতা এবং রাঁচীতে কবির নিরাময়ের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় কবিদম্পতিকে চিকিৎসার্থ পাঠানো হয় ইউরোপে—কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কবিদম্পতি ফিরে এলেন কলকাতায়। আরোগ্যের আশাপ্রদ খবর আর কিছু নেই। গড়িয়ে এলো ১৯৫৬ সাল। ইতিমধ্যে দুই পুত্র—সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধের বিয়ে হয়েছে। পুত্রবধূরাও কবির সেবা করেন। কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর উপস্থিতিতে এ-বছর কবির ঘরোয়া জন্মোৎসব। নজরুল নিজেই একদিন লিখেছিলেন—

হারিয়ে গেছো অন্ধকারে—
পাইনি খুঁজে আর,
আজকে তোমার আমার মাঝে
সপ্ত পারাবার!
আজকে তোমার জন্মদিন,
স্মরণ-বেলায় নিদ্রাহীন
হাতড়ে ফিরি হারিয়ে যাওয়ার
অকূল অন্ধকার

এই-সে হেথায় হারিয়ে গেছো
কুড়িয়ে পাওয়া হার।

অন্তঃপুরেও জন্মতিথি পালিত হয়।

আমি দ্বার খুলে আর রাখবো না পালিয়ে যাবে গো,
জানবে সবে গো নাম ধরে আর ডাকবো না পালিয়ে যাবে গো,
এবার পূজার প্রদীপ হয়ে জ্বলবে আমার দেবালয়ে
জ্বালিয়ে যাবে গো আর আঁচল দিয়ে ঢাকব না পালিয়ে যাবে গো।

বাল্য-লীলার পটভূমিতে গেলে যদি কবির স্মৃতি ফিরে আসে এই আশায় ১৯৫৬ সালের জুন মাসে নজরুল সাংস্কৃতিক সমিতি সপরিবারে কবিকে বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে নিয়ে যান। কবির জননী জন্মভূমি আজ নজরুলের নিজের ভাষাতেই বল্‌ছেন—

হারিয়ে পাওয়া ওরে আমার মানিক!
দেখেই তোরে চিনেছি,
আয়, বক্ষে ধরি খানিক।
বাণ-বেঁধা বুক দেখে তোরে
কোলে কেহ না নিক্,
(ওরে) হারার ভয়ে ফেলতে পারে
চিরকালের মা কি!
ওরে আমার কোমল বুকে কাঁটা বেঁধা পাখী!
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?
এ যেরে তোর চির-চেনা স্নেহ,
তুই তো আমার নস্‌রে অতিথ্
অতীত কালের কেহ,
বারে বারে নাম হারায়ে
এসেছিস এই গেহ।
এই মায়ের বুকে থাক্ যাদু তোর
যদিন আছে বাকি।

প্রাণের আড়াল করতে পারে
সৃজন দিনের মা কি ?
হারিয়ে যাওয়া! ওরে পাগল,
সে তো চোখের ফাঁকি !

কবির থাক্‌বার ব্যবস্থা হয়েছিল স্থানীয় স্কুল-বাড়ীতে। একদিন তাঁকে আদি বাড়ীতে আনা হল। কিন্তু স্মৃতি জাগে কই ? ছেলেবেলার বন্ধুবান্ধব প্রিয়জনদের দেখেও কি তোমার কিছু মনে পড়ছে না কবি। কথা কও! কথা কও!! কথা কও!!! নিশ্চিহ্ন এই মসজিদে সাঁজের বাতি জ্বালাতেন যিনি আজ সেই কবির মনের বাতি নিভে গেছে—হে ঈশ্বর ! সে বাতি তুমি জ্বালিয়ে দাও—জ্বালিয়ে দাও !

কাজীসাহেব

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পুরাতন ভগ্নপ্রায় রাজবাড়ি।

সামনে পিছনে ও বাঁয়ে অনেকটা খোলা মাঠ—ডান দিকে একটা দীঘি। তার মধ্যে একটা ভাঙা মন্দির—মন্দিরের ভিতর থেকে একটা বট গাছ শাখা-প্রশাখা মেলেছে—শহরেব ঐ দিকটায় ঠিক তেমন যাইনি কখনো আগে।

গ্রীষ্মের এক অপরাহ্নে বারীনেব সঙ্গে প্রথম সেখানে গেলাম—আমাদের স্কুলের নতুন টীচার অতুলানন্দ চক্রবর্তী নাকি ডেকেছেন।

মানুষটা মাস দুই হলো তখন আমাদের স্কুলে এসেছেন ইংলিশের নতুন টীচার, ছোটখাটো রোগা মানুষটি। কালো গায়ের রঙ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে খদ্দবেব ধুতি ও পাঞ্জাবি।

প্রথম দিনই মুগ্ধ হয়েছিলাম ইংলিশ পোয়েট্রিব ক্লাসে তাঁর স্পষ্ট ভরাট কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি শুনে।

যে পোয়েট্রিটা সেদিন পড়াবার কথা ছিল সেটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রথমেই আবৃত্তি করে শোনালেন। তারপর শুরু করেছিলেন ব্যাখ্যা।

বারীনের সঙ্গে মাঠে গিয়ে দেখি—অতুলানন্দ স্যার বসে বসে আবৃত্তি করছেন আব চার-পাঁচটি আমাদের সহপাঠি সেই আবৃত্তি মন দিয়ে শুনছে। কানে এল কবিতার কয়টি চরণ—

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় কবির বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার।
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে,
নব সৃষ্টির মহানন্দে।

আরো কাছে এগিয়ে গেলাম কি এক দুর্বার আকর্ষণে যেন। অতুলানন্দ তখনো আবৃত্তি করে চলেছেন—

মহা— বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হবো শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

সূর্য অস্ত গিয়েছে। আকাশে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামছে। দীঘির মধ্যস্থিত ভাঙা মন্দিরের বট গাছে পাখীগুলো কিচির মিচির করছে। আমরা কয়টি কিশোর মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছি। এক সময় কবিতা আবৃত্তি শেষ হলো। শেষ হলেও একটা শব্দের ঝংকার যেন সন্ধ্যার আবছা ধূসর আলোয় তখন রণরনিয়ে চলেছেঃ

আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির।

শুভংকর জিজ্ঞাসা করলো, কার কবিতা স্যার ?

জবাব দিলেন স্যার, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের।

মানুষটিকে না দেখেও সেই আমার প্রথম পয়িচয় তাঁর সঙ্গে। কবিতাটা সংগ্রহ করে মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। আজও মনে আছে তার কিছু কিছু অংশ।

কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে তারও অনেক পরে। বোধ হয় সেটা মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ার।

ছোট বোনের গান রেকর্ড করা হবে মেগাফোন কোম্পানীতে। মেগাফোন কোম্পানীর রিহার্সেল হতো হ্যারিসন রোডের একটা বাড়িতে।

বোনকে সঙ্গে করে গেলাম কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার জিতেনবাবুর কাছে, তিনি সঙ্গে করে আমাদের নিয়ে গেলেন রিহার্সেল রুমে দোতলায়।

হলঘর—তার মধ্যে করাস পাতা। চারিদিকে বাদ্যযন্ত্র ছড়ানো—একটি মেয়েকে হারমোনিয়ম বাজিয়ে তার গলায় গান তুলছিলেন এক ভদ্রলোক। মেয়েটির পরিচয় পরে পেয়েছিলাম—

বিনয় বাদল দীনেশ—সেই বিনয়ের ভাইঝি বোধ হয়। ঠিক মনে নেই এতকাল পরে।

হৃষ্টপুষ্ট এক ভদ্রলোক—উজ্জ্বল শ্যাম গাত্রবর্ণ। মাথায় ঝাঁকড়া চুল বাবরীর মত—পরনে ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবি—সিল্কের চাদরটা একপাশে এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে।

চম্‌কে উঠলাম।

কোথায় দেখেছি ওঁকে। বড় চেনা-চেনা।

জিতেনবাবু ডাকলেন, কাজীসাহেব—

কাজীসাহেব—মানে কাজী নজরুল ইসলাম নয়ত! নিশ্চয়ই তিনি।

কাজীসাহেব তাকালেন, বলুন—

এই মেয়েটির দুটো গান রেকর্ড হবে। বলে আমার বোনকে দেখালেন।

এসো—এসো, বসে যাও—হাসতে হাসতে কাজীসাহেব বললেন।

আমরা পাশে গিয়ে বসলাম।

সেই আমার সাক্ষাৎ পরিচয় প্রথম কাজীসাহেবের সঙ্গে। আমার ধ্যানের কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

কাজীসাহেব আবার গান শেখাতে শুরু করলেন যাকে গান শেখাচ্ছিলেন।

মেয়েটির রিহার্সেল হয়ে গেলে সে চলে গেল—তার পরেই কবি আমার বোনের দিকে তাকালেন। কি নাম তোমার ?

শোভা।

বাঃ, বেশ নাম। বলেই পাশের একটা খাতা টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করলেন গান।

মিনিট কুড়ির মধ্যে তুটো গান লেখা হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই সুর দিলেন, গাইলেন গান তুটি।

চমৎকৃত হয়েছিলাম সেদিন কবির গান ও সুর রচনা দেখে। কেবল গানের কথাই নয়—গানের সুরও যেন ওঁর আজ্ঞাবহ। কণ্ঠে যেন সরস্বতীর অধিষ্ঠান।

দশ-বারো দিন রিহার্সেল হয়েছিল—সেই দশ-বারো দিনে কবির সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা জমেছিল সে স্মৃতি আমার অমর হয়ে আছে স্মৃতির পাতায়।

যেমন আমুদে তেমনি রসিক মানুষটা। কি প্রাণখোলা হাসি।

ঘনিষ্ঠ ভাবে কবিকে জানবার পর মনে হয়েছিল কাজীসাহেবকে না চিনলে জীবনের আমার একটা দিক বুঝি শূন্যই থেকে যেত।

রিহার্সেলের সময়ই একটা দিনের কথা আজো মনে আছে। কবির সঙ্গে গাড়িতে তাঁর পাশে বসে যেন কোথায় চলেছি—হঠাৎ কোথায় কোকিল ডেকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে কবি সুর করে মুখে মুখেই রচনা করলেন একটি গানের কয়টি লাইন—

রেশমী চুড়ির তালে
কৃষ্ণচূড়ার ডালে—
পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা
ডেকে ওঠে পাপিয়া।

গান ও সুরের সাধক নজরুল ইসলাম, এমনিই দেখেছি তাঁকে। কি হালকা সুরের গান—কি দেশাত্মবোধক গান—কি শ্যামাসঙ্গীত—অনন্য তাঁর রচনাশৈলী—অপূর্ব তাঁর সুরের ছন্দ!

একদিন বলেছিলাম, আচ্ছা কাজীসাহেব, কখনো বোধ হয় গান লিখতে আপনাকে চিন্তা করতে হয় না?

হাসলেন কবি, গান আর সুর সঙ্গে সঙ্গে আমার ফেরে। তাদের ডাকতে হয় না—আপনি এসে ধরা দেয়।

অমন সদাহাস্যময় প্রাণখোলা মানুষটি হঠাৎ যেন এক-একসময় কেবল অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। যেন কত দূরে চলে যেতেন।

ডাকলেও তখন সাড়া পাওয়া যেত না।

পরবর্তী জীবনে আরো অনেক সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকারের সঙ্গে আলাপ হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে কিন্তু একাধারে অমন সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকার আর দ্বিতীয়টি আমার পরিচিতের মধ্যে দেখিনি।

শুনেছি রবীন্দ্রনাথ অমনি করে কথার সঙ্গে সঙ্গেই সুর রচনা করতেন কিন্তু দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

তারপর আর অনেক বছর কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেনি।

একদিন হঠাৎ শুনলাম কবি অসুস্থ। মনটা ব্যথায় ভরে গেল। ডাক্তারী করি তখন। গলব্লাডার অপারেশনের পর রাঁচি গিয়েছিলাম কিছুদিন বিশ্রামের জন্য—শুনলাম কবি তখন রাঁচির মেণ্টাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গেলাম একদিন দুপুরে।

ঘরের মধ্যে বসেছিলেন একটা চেয়ারে কবি—পাশেই শয্যায় কবিপত্নী।

কিন্তু একি দেখলাম!

এর চাইতে বুঝি না দেখাই সহস্রগুণে ভাল ছিল।

তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম। না, না—আমি দেখিনি তোমায় কবি, আমি দেখিনি। তারপর আর কখনো কবির সামনে যাইনি।

কবিপুত্র অশেষ স্নেহভাজন সব্যসাচী বহুবার বলেছেন তাদের ক্রিস্টোফার রোডের বাড়িতে যেতে, কিন্তু যাইনি।

কবি আজ নীরব। কবি আজ মূক।

আমার অন্তরের কাজীসাহেব ত মূক নয়—নীরবও নয়—সে যে চিরহাস্যময়—উর্মিমুখর আনন্দের প্রতীক।

কবি তুমিই ত গেয়েছিলে একদিন—

কবে সে ফুলকুমারী ঘোমটা চিরি' আসবে বাহিরে
শিশিরের স্পর্শসুখে ভাঙবে রে ঘুম রাঙবে রে কপোল॥
ফাগুনের মুকুল-জাগা দু'কুল-ভাঙা আসবে ফুলের বান,
কুঁড়িদের ওষ্ঠপুটে লুটবে হাসি, ফুটবে গালে টোল্॥

তবে কেন ঘুম ভাঙছে না, কেন ফাগুন জাগছে না—চোখের জলে ছোট্ট একটি প্রণাম জানাই তোমায় কবি আর প্রার্থনা জানাই, আবার তোমার সুর শোনাও—শোনাও তোমার গান।

'তোরা সব জয়ধ্বনি কর'

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহার

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেশজোড়া শান্তি উৎসবের আয়োজন করেছেন। মওলানা মোহম্মদ আলী, শেখুল হিন্দ মাহমুদউল হাসান প্রমুখ নেতাগণ ঘোষণা করেছেন—শান্তি উৎসবের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক নেই। ধীরে ধীরে গান্ধীজীর নেতৃত্বে হিন্দুরাও এসে এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। খিলাফতের অবিচার—জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের প্রতিবাদে দেশ মুখর হয়ে উঠল।

আমরা তখন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র। চট্টগ্রাম বহুদিন থেকেই বিপ্লববাদ ও সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্র। চট্টগ্রাম আবার বিপ্লবীর আড্ডা মিউনিসিপ্যাল স্কুল। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর সেনাপতি অনন্তলাল সিং, গণেশচন্দ্র ঘোষ, প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী এই স্কুলে ছিল আমার সহপাঠী।

অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার আমাদের গায়ে এসেও লাগছিল। এক-একবার মন উতলা হয়ে ওঠে। এক-একবার ভাবি গতানুগতিক জিওমেট্রির থিওরেম মুখস্থ ক'রে জীবন কাটানো—তা' আর করছিনে। বিপিন পালের মুখে শুনলাম, তাঁর তিন বন্ধুতে মিলে রক্তের অক্ষরে লিখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন: সাম্রাজ্যবাদের অধীনে তাঁরা চাকরী করবেন না। আমরাও প্রতিজ্ঞা করলাম, জীবনে আর যাই করি, চাকরি গ্রহণ করব না, করব না, করব না।

অসহযোগ, বিপ্লব ও বিদ্রোহের নিত্য নতুন আইডিয়া মাথায়

আসতে লাগল। ক্লাসের নীরস আবহাওয়ায় মনকে আর বেঁধে রাখা যায় না। মেতে উঠলাম জীবনের বৈচিত্র্যের সন্ধানে। রামমূর্তির সার্কাস, মুকুন্দ দাসের যাত্রা, বিপিন পাল ও শওকত আলীর বক্তৃতা, কর্ণফুলীতে সাম্পান চালানো, দোভাষীর জাহাজ ভাসানো, ফুটবল, দাঁড়িয়া-বান্ধা খেলা, এসবে আর মন ভরছে না। কয় বন্ধুতে মিলে হাতের লেখা কাগজ বার করা গেল। গণেশকে নিয়ে ছেলেদের জন্য এক লাইব্রেরী তৈরী ক'রে ফেললাম, এর সঙ্গে প্রমোদকে নিয়ে ব্যায়ামের জন্যে ক্লাব। অনন্ত আরও খানিকটা নতুনত্বের সন্ধান দিল— পাঁচকড়ি দে'র ডিটেকটিভ, তীরধনু, ম্যাজিক, তার নিজের তৈরি বাঁশের বন্দুক। তারপর রবীন্দ্রনাথ ও মাইকেলের কবিতা আবৃত্তি। মন তবু ভরে না—চাই নতুন কিছু; তাজা আনকোরা, যাতে পাওয়া যাবে প্রাণশক্তির উল্লাস।

মন যার জন্যে উতলা হয়ে উঠেছিল, একদিন তার সন্ধান মিলল। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কলকাতা থেকে কয়েক কপি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

একদিন পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা গল্পের উপর চোখ পড়ল। গল্পটির নাম 'হেনা'। লেখকেরও অদ্ভুত নামঃ কাজী নজরুল ইসলাম, হাবিলদার বঙ্গবাহিনী, করাচী। কয়েক লাইন পড়েই লাফিয়ে উঠলাম।

"ওঃ কি আগুন বৃষ্টি! আর কি তার ভয়ানক শব্দ! গুড়ুম, দ্রুম দুম! আকাশের একটুও নীল দেখা যাচ্ছে না, যেন সমস্ত আসমান জুড়ে আগুন লেগে গেছে। গোলা আর বোমা ফেটে ফেটে আগুনের ফিন্‌কির এত ঘন বৃষ্টি হচ্ছে যে, অত ঘন যদি ঝরত আসমানের নীল চক্ষু বেয়ে, তা' হ'লে একদিনেই সারা দুনিয়া জলে জলাকার হয়ে যেত।"

তারপর ছায়াচিত্রের মত চোখের সামনে ভেসে উঠল সিন নদীর ধারে তাম্বু, ফ্রান্স, প্যারিসের পাশে ঘন বন, হিণ্ডেনবার্গ লাইন,

কোয়েটার দ্রাক্ষাকুঞ্জস্থিত আমার ছোট্ট কুটির, ডাক্কা ক্যাম্প, কাবুল · ইত্যাদি।

লেখাটা গণেশকে পড়ে শোনালাম। পড়ে গণেশ বললে, তাইতো, চমৎকার, খাসা! উনপঞ্চাশ বাহিনীর হাবিলদার, বন্দুক ছেড়ে গল্প লিখতে বসেছে। আচ্ছা, লোকটা কবিতা লেখে না কেন? কিছুদিন পরেই হাবিলদার লেখকের কবিতার সন্ধান মিলল, 'মোসলেম ভারত' কাগজে।

'শাতিল আরব। শাতিল আরব!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন
ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।

*

সাহারায় এবা ধুঁকে মরে তবু
পরে না শিকল পদ্ধতির
শাতিল আরব! শাতিল আরব!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর!
শহীদের দেশ, বিদায় বিদায়।
এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।'

রক্ত নেচে উঠল। তার পর কয়েক মাসের মধ্যেই 'মোহর্রম', 'কোরবাণী', 'খেয়া পারের তরণী', 'আনোয়ার', 'কামাল পাশা', বিদ্রোহী' —ছাপার অক্ষরে দেখা দিতে লাগল মাসিকের পাতায়। কি সৌভাগ্য আমাদের! কি বিস্ময়! ভাষা ও ছন্দের বৈচিত্র্যে, ভাবের উদ্দাম প্রবাহে, বলবার বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে প্রত্যেকটি কবিতাই আগুনের শিখার মত প্রোজ্জ্বল, উজ্জ্বল, লেলিহান! এতদিন ধরে আমরা যার সন্ধান করছিলাম, এ যে তাই! বিপ্লবের অগ্নিদীক্ষার পর আমাদের মনে যে ভাবগুলো ভিড় জমিয়েছিল, কবি প্রকাশ করেছেন তাই আগুনের ভাষায়।

নজরুল কাব্যে এই যে আমাদের অবগাহন, এ থেকেই সূত্রপাত হ'ল আমাদের সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবনের।

ব্যক্তিগতভাবে যে কথা বলা হ'ল—বাংলার বহু সাহিত্যিক, বহু কবি, বহু শিল্পী, বহু রাজনৈতিক কর্মীর নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে এই-ই বলবার কথা।

এক কথায় বলতে গেলে নজরুল ইসলামের কাব্য আমরা শুধু পড়ি নি, এতে করেছি আমরা অবগাহন; তাই এর বিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সাপুড়ের বাঁশীর মত এ আমাদের করেছে ঘরছাড়া, শুধু আমাদের, মানে মুসলমান ছেলেদের নয়, বিপ্লবী হিন্দু ছেলেদের মনেও দিয়েছে এ অদ্ভুত রকমের দোলা। অনন্ত সিংহের কাছে শুনেছি, আলিপুর জেল থেকে আন্দামানে যাওয়ার পথে, এমন কি আন্দামান জেলে বাংলার বিপ্লবী তরুণের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে নজরুলের গান:

'শিকল পরা ছল মোদের এই
শিকল পরা ছল,
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের
করব রে বিকল।

* * *

ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝন্‌ঝনা,
এ যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ বন্দনা।'

প্রমোদরঞ্জন ফাঁসি যাওয়ার সময় নাকি গর্জে উঠেছিল কবির ভাষায়:

'মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি
মৃত্যুজয়ের ফল,
মোদের অস্থি দিয়ে জ্বলবে দেশে
আবার বজ্রানল।'

জেলখানায় ইংরেজ জেল-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বিপ্লবী যুবকদের ওপর জুলুম করছেন—তার পাল্টা জবাব দিতে হবে।

কাজীদা লিখলেন ঃ

'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে
তুমি ধন্য, ধন্য হে।
আঁকাড়া চালের অন্ন লবণ,
করেছ আমার রসনা লোভন
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা 'লাপ্‌সা' শোভন
তুমি ধন্য, ধন্য হে।'

অসহযোগ আন্দোলনের আগে ফজলুল হক সাহেবের দৈনিক কাগজ 'নবযুগ' বেরিয়েছে। এর সম্পাদনার ভার মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবের উপর। কাগজখানির অভিনবত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এমন অদ্ভুত হেডিং কেউ দেখেনি।

'এদেশ ছাড়বি কিনা বল
নইলে কিলের চোটে হাড় করিব জল।'

'কালতে ধলাতে লেগেছে এবার মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই ওগো, এমন ডিনার খাওয়া।'

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা ফৈসুল হে আমার।'

নজরুল ইসলাম 'নবযুগে'র ছিলেন সহকারী সম্পাদক। কিন্তু এই হেডিং আর অভিনবত্বের গোড়ায় ছিলেন তিনিই। ১৯২২ সনের ১১ই অগস্ট আবির্ভাব হল দ্বি-সাপ্তাহিক কাগজ 'ধূমকেতু'র। 'মাভৈঃ বাণী'র ভরসা নিয়ে, জয় প্রলয়ংকর বলে ধূমকেতুকে রথ ক'রে সারথির যাত্রা শুরু হ'ল। 'ধূমকেতু'র জন্যে আমাদের মনে দস্তুরমত নেশা ধরেছিল। এর কপি পাবার জন্যে এক এক-দিন বসে থাকতাম গিয়ে আমরা পোষ্টাফিসে। এই সারথি আর কেউ নয় - কাজী নজরুল, ইসলাম। তখনো কাজীদা'কে দেখিনি। কলকাতা-ফেরত ছেলেদের

কাছে শুধু গপ্‌প শুনেছি—সৈনিক-কবি হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম করাচী থেকে কলকাতায় এসে আসর জমিয়েছেন। যোধপুরী ব্রিচেস প'রে, ময়ূরকণ্ঠি রঙের কোট গায়ে ঘুরে বেড়ান তিনি কলকাতার রাস্তায়। অদ্ভুত লোক, জাত বোহেমিয়ান; হাসে, গায়, লোকটা একাই একশ'। মুখে কথার খই ফোটে, গানের ঝরনা বয়ে যায় গলায়।

কাজীসাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হুগলীতে, কিন্তু তার বহু আগেই তাঁকে মেনে নিয়েছি জীবন-পথের অগ্রদূত হিসেবে। হঠাৎ একদিন বন্ধুবর মঈনুদ্দীনের সঙ্গে হুগলীতে রেলের লাইনের ধারে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। শুনলাম, তিনি উত্তর-পাড়ায় এক সভায় গেছেন। রাত্রি ন'টার সময় তিনি ফুলের মালা গলায় পরে বাড়ী ফিরে এলেন। বিশেষ পরিচয় ক'রে দিতে হ'ল না। দেখেই তিনি হেসে উঠলেন, যেন যুগ যুগের চেনা। উপস্থিত কেউ বুঝতেও পারল না, সেই আমাদের প্রথম পরিচয়।

কাজী সাহেব চট্টগ্রামে আমাদের বাড়ী গিয়েছেন কয়েকবার। যে কয়দিন তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে, মনে হ'ত বাড়ীখানি যেন ভেঙে পড়বে। রাত্রি দশটায় থারমোফ্লাস্ক ভ'রে চা, বাটাভরা পান, কালিভরা ফাউণ্টেন পেন, আর মোটা মোটা খাতা দিয়ে তাঁর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিতাম। সকালে উঠে দেখতাম, খাতা ভর্তি কবিতায়। এক-এক ক'রে 'সিন্ধু', 'তিন তরঙ্গ', 'গোপন প্রিয়া', 'অনামিকা', কর্ণফুলী', 'মিলন মোহানায়', 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি', 'নবীনচন্দ্র', 'বাংলার আজিজ', 'শিশু যাতুকর', 'সাত ভাই চম্পা'—আরও কত কবিতা লিখেছেন আমাদের বাড়ীতে বসে। চট্টগ্রামের নদী, সমুদ্র, পাহাড়, আমাদের বাড়ীর সুপারি গাছগুলো আজ অমর হয়ে আছে তাঁর সাহিত্যে।

সারা রাত কবি চা আর পান খেতেন—আর খাতা ভর্তি করতেন কবিতা দিয়ে। দুপুরে কখনো কিছু পড়তেন, কখনো করতেন

পামিষ্ট্রীর চর্চা, কখনো বা মশগুল হতেন দাবা খেলায়। বিকেলে দল বেঁধে যেতাম নদীতে, সমুদ্রে। সাম্পানওয়ালারা এসে জুটত, সুর ক'রে চলত সাম্পানের গান। সবাই মিলে গান ধরতাম। 'আমার সাম্পান যাত্রী না লয়, ভাংগা আমার তরী,' ··'ওগো গহীন জলের নদী' ·· ··এক-এক সময় চট্টগ্রামী সাম্পানওয়ালারা গাইত— 'বঁধুর আমার চাটির্গা বাড়ী—বঁধুর আমার নন্দীর কুলে ঘর—কর্ণফুলীর উত্তর পারে লালকুঠির উপর বন পুড়িতে সকলে দেখে, মন পুড়িতে কেউ না দেখে, বন-পোড়া হরিণীর মত কবার হইলাম মুই নারী, বঁধুর আমার চাটির্গা বাড়ী।'

এক-একবার বেড়াতে যেতাম ঘোড়ায় চ'ড়ে পাহাড়ে। কখনো পরতেন তিনি আরবী পোশাক, কখনো বা ব্রিচেস। কাজীসাহেবকে নিয়ে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের পাহাড়, জঙ্গল, হ্রদ, জলপ্রপাত, খালবিল, নদী-চরে বেড়িয়েছি। সঙ্গে ছেলের দল। এতবড় বিদ্রোহী বীর, কিন্তু জোঁককে তিনি বড় ভয় করতেন। একবার সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে উঠে জোঁকের ভয়ে আর তিনি নামতে চান না। কয়েকজন মিলে কাঁধে ক'রে তাঁকে নামাতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

আমার জীবনের একটা মজার ঘটনা কাজীসাহেবকে নিয়ে। আমার আত্মীয়েরা সকলেই প্রায় সরকারী চাকুরে। সবাই ধরে বসলেন আমাকে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় পাশ হলাম, ডাক্তারী পরীক্ষা হয়ে গেল। শুধু Secretary of State-এর মঞ্জুরী বাকী। কাজীসাহেবের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করা হ'ল, নিযুক্তি-পত্র এলে কলকাতা কংগ্রেসের সময় মঞ্চের উপর উঠে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করতে হবে। কাজীদা'র . ভক্ত-শিষ্য পুলিশের চাকরী করবে, তিনি সইতে পারতেন না পদত্যাগ আমাকে আর করতে হয়নি। কথাটা আগেই বেরিয়ে পড়েছিল। টেগার্ট সাহেবদের দৌলতে ইংরেজের চাকরির খাতা থেকে আমার নাম কেটে যায় চিরদিনের জন্যে। আমি তখন কাজীসাহেবকে নিয়ে সভা

ক'রে বেড়াচ্ছি। কাজীসাহেব বক্তৃতা করছেন—'গান্ধীজীর দল কাটছে চরকা—আমরা কাটব মাথা।' কাজীসাহেবের মনে কারুর প্রতি বিদ্বেষ দেখিনি কোনদিন। তিনি ছিলেন সকল ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে। মাঝে মাঝে তিনি বলতেন—

'দে গরুর গা ধুইয়ে।'

গরুর গায়ে পানি ঢেলে দিলে সে যেমন ক'রে আনন্দে লাফাতে থাকে, তার মধ্যে তখন থাকে না বিদ্বেষ-বিষ, সে-রকম অনাবিল আনন্দের ধ্বনি এই—

'দে গরুর গা ধুইয়ে।'

নজরুলকে 'জাতীয় কবি' বললে সবটুকু বলা হ'ল না। আমাদের জীবনে নজরুল ইসলাম কতখানি জাগয়া জুড়ে আছেন, পরিমাপ করা সহজ নয়। এক কথায় বলতে গেলে কাজীদা'কে বাদ দিয়ে আমরা নিজের কথা ভাবতেই পারিনি। আমাদের রাজনীতি, আমাদের সাহিত্য, আমাদের মানস ও মনন—এক কথায় আমাদের জীবনের অনেকখানি তো তাঁরই হাতে গড়া।

তাঁরই লেখায় আমরা প্রথম পেয়েছি জীবনের আস্বাদ। তাঁর নাটকীয় জীবন, উদ্দাম প্রাণশক্তি, মনুষ্যত্বের বেদনাবোধ, দুরন্ত অভিনবত্ব, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছেলেবেলায় আমাদের যেভাবে আকর্ষণ করেছে, তেমনভাবে করেনি অন্য কিছু। পথে বেরুবার উদাত্ত আহ্বান শুনেছি আমরা তাঁরই গানে। বাংলার লক্ষ-লক্ষ কৃষক-শ্রমিক সর্বহারার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা রস-মূর্তি লাভ করেছে তাঁরই লেখায়। ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে বছর বিশেক কবি তাঁর সাহিত্য-রস বিলিয়েছেন। বিশ বছর সভা-সমিতির উদ্বোধন হয়েছে তাঁর গান দিয়ে। মজলিস জমেনি তাঁর গজল না হ'লে। রেডিও, সিনেমা, থিয়েটার, গ্রামোফোন অচল হয়েছে তাঁকে না পেলে। গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ। গানের সংখ্যার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকেও হার মানিয়েছেন নজরুল ইসলাম।

কাজীদা'র কাব্য বিচার করা আমাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। তাঁর 'অগ্নিবীণা', 'ভাঙার গান', 'বিষের বাঁশী' সাপুড়ের মত আমাদের করেছে ঘরছাড়া। তাঁর সাহিত্যে আমরা করেছি অবগাহন। কবিকে নানারূপে দেখবার সুযোগ হয়েছে আমাদের। সাহিত্যিক হিসাবে, সম্পাদক হিসাবে, খেলার মাঠে, দাবা খেলায়, পামিস্ট্রীর ছাত্ররূপে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, বিচারালয়ে, কারাগারে, পাহাড়ে, নদীতে, সমুদ্রে, সিনেমায়, থিয়েটারে, এ্যাসেম্বলী ইলেকশনে, জীবনের কত ক্ষেত্রেই না দেখেছি তাঁকে। যতই দেখেছি ততই তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাদের আকর্ষণ করেছে।

বাংলার জাগরণের নকীব ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। আর মুসলিম জাগরণ, তার তো তিনিই স্রষ্টা, প্রধান উদ্গাতা। কাব্যে, সাহিত্যে, সাংবাদিকতায়, গানে, শিল্পে, আর্টে যে সব মুসলিম তরুণ সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই যাত্রা শুরু হয়েছে তাঁকেই কেন্দ্র ক'রে। বহু অখ্যাত, অবজ্ঞাত পল্লীর অজ্ঞাত-কুলশীল যুবককে কাজীসাহেব উন্নতির রাজপথে তুলে দিয়েছেন, এর নজীরের অভাব নেই।

আজ মফঃস্বলে বসে ভাই-বোন দু'জনে লেখার মক্শ করছি। দু'চারটি লেখা বেরিয়েছে প্রবাসী, সরণী, সাধনা, সওগাত, কল্লোলে। কাজীদা'র অমর অবদান 'সিন্ধু-হিন্দোল' বেরুতে দেখি উৎসর্গ করেছেন আমাদের দু'ভাইবোনকে।

'কে তোমাদের ভালো ?

বাহার আন গুলশানে গুল, নাহার আন আলো।
বাহার এলে মাটির রসে, ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
নাহার এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান।
তোমরা দুটি ফুলের দুলাল ! আলোর দুলালী !
একটি বোঁটায় ফুটলি এসে নয়ন ভুলালি !
নামে নাগাল পাইনে তোদের নাগাল পেল বাণী,
তোদের মাঝে আকাশ-ধরা করছে কানাকানি !'

রবীন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার, বারীন ঘোষের মত লোক আনন্দ লাভ করেছেন যাঁর উৎসর্গ করা বই পেয়ে, তিনি 'সিন্ধু-হিন্দোল' উৎসর্গ করেছেন আমাদের নামে! আনন্দে বুক ভ'রে গেল। এত আনন্দ জীবনে পাইনি, জানি না পাব কিনা কখনো। বিদ্রোহী-কবির এই দান জীবন-পথে পাথেয় হয়ে থাকবে আজীবন।

কবি আজ আমাদের মধ্যে নেই। বিদ্রোহের পথে, বিপ্লবের কালে কবির উদাত্ত আহ্বানের ঐতিহাসিক মূল্য যাই হোক না কেন, মহাকালে তার কাব্যমূল্য কি হবে, অনেকই প্রশ্ন করেন। কিন্তু বিপ্লবের মেঘ-গর্জনের ফাঁকে তাঁর চোখে যে কয় ফোঁটা পানি দেখা দিয়েছে, কালের কপোলে তা ফুল হয়ে দুলে রইবে। চিরন্তন ক্রন্দসীর ক্রন্দনের অশ্রুমালা মহাকালকে চিরদিনই হার মানিয়েছে।

দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন দেশে বহু বৎসর পরে কবির ভাণ্ডার গানের আর কদর থাকবে কি না, কে জানে? কিন্তু তাঁর গানের মালা অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরদিন। আজ থেকে বহু বহু দিন পরেও শুধু অজয়-দামোদর নয়, মেঘনা, করতোয়া, কর্ণফুলীর তীরেও বিরহীর কণ্ঠে গুঞ্জরণ শোনা যাবে :—

'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চল গো গৌরী
চল জলে চল কাঁদে বনতল
ডাকে ছলছল জল-লহরী।
দিবা চলে যায় বলাকা পাখায়
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়,
কেঁদে চোখাচখী মাগিছে বিদায়
বারোয়াঁর সুরে ঝুরে বাঁশরী।'

আজকের মত সেদিনও লক্ষ লক্ষ ভক্তের মুখে ধ্বনিত হবে :

'তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।'

নজরুল-কথা

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

প্রতি বৎসর নজরুল ইসলামের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর বাড়ীতে ছোটোখাটো একটা উৎসব হয়। অনেকে যান কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে। আমি কোনোদিন যাইনি। আমার মনশ্চক্ষে স্বাস্থ্যদীপ্ত প্রাণবন্ত যে নজরুল জাগরুক আছেন, তাঁর স্থানে আজকের এই হত-চেতন ব্যাধি বিকল নজরুলকে বসার আসন ছেড়ে দিতে আমার ব্যথা লাগে।

ঢের দিন হয়ে গেল, বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশ বছরই হবে। স্বর্গীয় হেমন্তকুমার সরকার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন নজরুলের সঙ্গে। নজরুল তখন থাকতেন বিবেকানন্দ রোড থেকে নিষ্ক্রান্ত ছোট্ট একটি রাস্তায়, তার নাম জেলেটোলা। তাঁর বাসা ছিল একটু ভিতরের দিকে। আর ঠিক বড় রাস্তার মুখের ওপর ছিল তাঁর বুলবুল সঙ্গীত বিদ্যালয়। বুলবুল তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র, তার অকাল মৃত্যুর বেদনাই পরিস্ফুট হয়েছিল এই বিদ্যালয়ের নামকরণের মধ্যে।

এই বাড়ীতে আমি মাসে একবার দু'বার, কখনো কখনো তিনবারও যেতাম। সাধারণত যেতাম বিকেলের দিকে। দুপুরে আহার ও অল্প একটু দিবানিদ্রার পর উঠে নজরুল দোতলার ঘরে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করতেন, তারপর কখনো একলা, কখনো সদলবলে গ্রামোফোন কোম্পানীতে যেতেন।

স্কুলের পড়ানো শেষ হলেই সরাসরি চলে আসতাম আমি তাঁর কাছে। কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ একদিন নজরুল বললেন, আচ্ছা, যখনি আসো ঠিক এক সময়ে আসো। ব্যাপারটা কি বলো ত?

বললাম, স্কুলে পড়াই ত। ছুটি হলেই সোজা বাসে উঠে পড়ি। এক দৌড়ে কালিঘাট থেকে বিবেকানন্দ রোড চলে আসি।

আর কোথায় যাবে ? হাঁক ডাক ক'রে তখনি জলখাবার আনিয়ে টেনে বসালেন তিনি থালার সামনে। বললেন, খালি পেটে কাব্য-চর্চা হয় না হে ভায়া।

এই থেকে রেওয়াজ হয়ে গেল, আমি গেলেই এক থালা খাবার। কখনো কবি-পত্নী স্বয়ং দিয়ে যেতেন, কখনো তাঁর জননী।

কবি-পত্নী বৈদ্যকন্যা, আমিও বৈদ্য। এটা ছিল নজরুলের একটা নিয়মিত কৌতুকের বিষয়। গৃহিণীকে বলতেন, গোপাল তোমার ভাই, অতএব আমার কে হল বলো ত ?

এই আসরে নজরুল তাঁর সদ্যরচিত গান গেয়ে শোনাতেন। সাহিত্য রাজনীতি, ধর্ম— নানা বিষয়ে তাঁর মতামত বলতেন। হো হো করে হাসতেন, কৌতুকে কোলাহলে চারিদিক মাতিয়ে তুলতেন।

আলোচনা তাঁর খুব গভীর বা অন্তর্ভেদী হত না। ধারালো শব্দ এবং অধিকতর ধারালো ব্যঙ্গের সাহায্যে তিনি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে চাইতেন। তবে তর্কে হারলে, উদারভাবে পরাভবও স্বীকার করতেন তিনি। হেসে বলতেন, যানে দেও কণ্ডাক্টর !

রবীন্দ্র-ভক্তিতে তিনি ছিলেন সবার ওপরে। কবিতা-প্রার্থী জনৈক সাপ্তাহিক সম্পাদক একদিন তাঁকে বলেন, গানে আপনিই রাজা। বোলপুরী ভক্তরা যাই বলুন···

এক ধমক দিয়ে উঠলেন নজরুল। বললেন, আমরা যদি কেউ না জন্মাতাম, যদি এক লাইনও কেউ না লিখতাম, বাংলা দেশের কোন ক্ষতি হত না। ঐ একটি মানুষই চিরদিনের মহড়া রাখতেন।

বলেই এক-তাড়া কবিতা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, যেটা ইচ্ছে নিয়ে যাও। কিন্তু ওরকম অপরাধের কথা আর কোনোদিন মুখে আনবে না। রবীন্দ্রনাথের গান—ও বেদমন্ত্র !

সে সময় তিনি একটি গ্রামোফোন কোম্পানীর একমাত্র সঙ্গীত-

লেখক ছিলেন। প্রতিদিনই তিনি গান লিখতেন, একটা, দুটো, তিনটে। গান লেখায় একদিনের জন্যেও যেমন বিরাম ছিল না তাঁর, বৈচিত্র্যের তেমনি অন্ত ছিল না সে-সব গানে। কখনো কীর্তন, কখনো শ্যামা-সঙ্গীত, কখনো গজল, কখনো বা আধুনিক ধারার প্রেম-সঙ্গীত। মাঝে মাঝে লিখতেন জাতীয় সঙ্গীতও। তবে তার ঝোঁকটা তখন কম!

সব গানেরই তিনি নিজে সুর দিতেন। টেবিল বাজিয়ে বা উরুত চাপড়ে গুন্ গুন্ করে ভাঁজতেন গানের পদগুলি, তারপর সবটা তৈরি হয়ে গেলে গাইতেন গলা ছেড়ে। আর তখনি কাগজ কলম নিয়ে খস্ খস্ করে লিখে ফেলতেন গানটি। পরিষ্কার ঝকঝকে গোটা গোটা অক্ষর, কোথাও কাটাকুটি হত না লেখায়। লিখতে দেরী হয়ে গেলে হয়ত দু'এক কলি ভুলে যেতেন। তার ফলে খঞ্জ গানটিকে অনেক সময় আর খাড়াই করতে পারতেন না। হতাশ হয়ে বলতেন, যাঃ পালাল!

এই পলাতক গানের কলি নিয়ে একদিন বেঁধে ফেললেন এক গান : পালাল, পালাল, ধর, আমার চপল গানের পরী! আর একদিন ফরমায়েস এসেছে কীর্তন বাঁধতে হবে। মনে সুরও এসেছে। গলায় কিন্তু কথা আসেনি তখনো। ইতিমধ্যে হাজির হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠলেন, চির আনন্দে নন্দিত, ওগো নন্দগোপাল···

চব্বিশ ঘণ্টা এমনি একটা গানের মৌজে আবিষ্ট থাকতেন তিনি। গুন্-গুন্ করে সুর ভাঁজতেন, আর পান চিবুতেন। কখনো ভাবতে হত না, সুর বা শব্দের জন্যে কোন সময় থামতে হত না। পাখীর গলায় যেমন অনায়াসে গান আসে, নজরুলের গলায়ও ঠিক তাই আসত।

বেলঘরিয়ার এক বাগান বাড়ীতে কবি যতীন বাগচীর সম্বর্ধনা হল। অনেকের সঙ্গে নজরুলও এলেন তাতে নিমন্ত্রিত হয়ে। সবাই আমরা টুকিটাকি লেখা পড়লাম, না-হয় বক্তৃতা দিলাম। নজরুল

সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করলেন এক গান এবং দরাজ গলায় তা গেয়ে মাৎ করে দিলেন আসর ঃ

তোমার চলার শ্যাম বনপথ
কদম-কেশর কীর্ণ,
কেয়ার বনের খেয়াঘাটে হলে
গোপনে কি অবতীর্ণ ?

মাথা-ভরা অজস্র ঘন কালো চুল, প্রাচুর্যায়ত উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, মুখ-ভরা পান, তারি সঙ্গে অফুরন্ত হাসি, অফুরন্ত গান···এই ছিলেন সেদিনের নজরুল। তাঁর বাড়ীর দরজা যেমন, হৃদয়ের দরজা তেমনি, অবারিত ছিল সকলের জন্যে! অনেক উঁচু-দরের মানুষেরও দেখেছি হিন্দুর মনে মুসলমান সম্বন্ধে এবং মুসলমানের মনে হিন্দু সম্বন্ধে যেন একটু কেমন-কেমন ভাব থাকে। সেটা ছিল না তাঁর মোটেই। হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব অতিক্রম করে সার্থক মনুষ্যত্বে উন্নীত হয়েছিলেন তিনি, এটা বেশ ভালভাবে যাচাই করেছি। নজরুলের উপদেশেই আমি কোন বিখ্যাত নেতার মোহম্মদ-জীবনী বিষয়ক বইটি পড়ি। বইটির আলোচনা করতে করতে একদিন বলি, এতবড় পণ্ডিত শেষ পর্যন্ত কি করে অমন কাঠমোল্লা হলেন ?

নজরুল হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, কাঠ না, কাঠ না, অকাঠ মোল্লা। রাজনীতি। রাজনীতি! রাজনীতি মানুষকে ঐ রকম টেনে নামায় রে ভাই!

একদিন গোপেন নামে এক অটোগ্রাফ-সন্ধানী বালককে নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। তার হাত থেকে খাতাখানি নিয়ে তিনি ঝাঁ ঝাঁ ক'রে লিখে চললেন

গোপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,
করেন বহু মহৎ কার্য।
পূজা আহ্নিক, গঙ্গাস্নান,
ঘি সৈন্ধব আতপ খান!

গোপেন কিনা, তাই অবিশ্যি,
গোপনেতে হয় হবিষ্যি
সীতা-পতি পক্ষী যোগে,
কেউ জানে না পাড়ার লোকে ··

এমনি একটা লম্বা কবিতা। কি হিন্দু, আর কি মুসলমান, ধর্মের ব্যাপারে কোন তরফেই ছিল না তাঁর অণুমাত্র গোঁড়ামী বা পক্ষপাত। দু'দলকেই বেদম ঠাট্টা করতেন কথায়, কবিতায়, গানে।

কিন্তু কি যে হল, হঠাৎ কালী সাধক হয়ে পড়লেন নজরুল। একদিন শুনলাম, কোন বিখ্যাত মজুমদারের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন তিনি এবং গলায় জবা ফুলের মালা ও কপালে সিঁদুরের টিপ পরে তিনি নাকি শ্মাশানে বসে ধ্যান করেন।

শুনে ভাল লাগল না। কৌতূহল নিয়ে দেখতে গেলাম তাঁকে। দেখলাম যা শুনেছি, একেবারে মিথ্যা নয় তা। এরপরই হু-হু করে বদলে গেল তাঁর সমস্ত ধরণ-ধারণ। হাসি-খুশি কমে গেল। কথা-বার্তার মাঝখানেই কেমন যেন এক এক সময় আনমনা হয়ে থাকতে শুরু করলেন। এক-আধটা কথাও তাঁর যেন অসংলগ্ন ঠেকতে লাগল। অর্থাৎ ধর্ম-বাতিকে পেল তাঁকে।

একদিন বললাম, কাজীদা, তুমি কবি। কাব্য-সরস্বতী ছাড়া আর কোন দেবতার কাছেই বিবেক বন্ধক দিও না।

হঠাৎ রেগে উঠলেন। বললেন, পড়াশোনা বিস্তর করেছ ভাই। কিন্তু পড়াশোনায় সব জিনিসের নাগাল পাওয়া যায় না। এমন ঢের বস্তু আছে, যা সারা জীবন তপস্যা ক'রেও হাতে পাওয়া যায় না।

অবাক লাগল। আস্তে আস্তে ব্যবধানের পর্দা পড়ে গেল এখানেই। সে পর্দা সুদীর্ঘ কালেও আর সরাতে চেষ্টা করিনি। আমার মানস কল্পনায় তাই জাগ্রত জীবন্ত গায়ক কবি নজরুলই অক্ষয় হয়ে আছেন এবং আছেন তাঁর যৌবন মূর্তিতে। এ মূর্তির রূপান্তর

হতে দিইনি আমি। হতে পারে এ আমার একটা দুর্বলতা। কিন্তু মানুষ দুর্বলতার উর্ধ্বে নয়।

বাস্তবিকই আমি মনে করি, নজরুলের যদি কোন পরিচয় সত্য হয় ত সে তাঁর যৌবন পরিচয়। এমন জলজ্যান্ত জোয়ান দুই-তিন দশকের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে আর কেউ ছিলেন না। অমন অকারণ আবরণ হাসি কারোকে হাসতে দেখিনি। অমন দরাজ দিল-দরিয়া ধরণ, অমন অনায়াসে অন্যায় করার সাহস এবং তা অকপটে স্বীকার করার অধিকতর সাহস, এ-ও কারো দেখিনি।

সেদিন দেশে যাঁরা তরুণ সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন জন্ম-প্রবীণ। জগৎ ও জীবনকে তাঁরা সুরু থেকেই দেখতে আরম্ভ করেন কেমন এক বিষণ্ন ধূসর মূর্তিতে। সে-দৃষ্টিতে তৃষ্ণা ছিল, নৈরাশ্য ছিল, দার্শনিকতা ছিল, ছিল না বাস্তবতা। ছিল না এতটুকু রৌদ্রোজ্জ্বল সত্য উপলব্ধির দীপ্তি, যা সমস্ত বেদনা-বঞ্চনার উপর জয়ী হয়ে ওঠে। আসলে বইয়ের পাতা থেকে ফ্রয়েডীয় অবচেতনাবাদ ও মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে সাহিত্যের আসরে এনে পত্তন করেছিলেন তাঁরা। জীবনের উত্তাপে সত্যি হয়ে ওঠেনি এই নূতনের পত্তন, যদিও তা-ই সৃষ্টি করেছিল সেদিন বাংলা সাহিত্যে প্রবল একটা বাঁধ ভাঙার আন্দোলন।

এই জায়গায় নজরুল কিন্তু আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তাঁর উপলব্ধির দুনিয়া সীমাবদ্ধ, অনুভূতিও গভীর অগভীর। কিন্তু তার ভিত্তি অকৃত্রিম। সত্যিকার উপলব্ধি ও সত্যকার জীবনবোধকেই তিনি প্রচুরায়ত প্রাণের আবেগে ব্যক্ত করেছেন। সে প্রকাশে কোথাও হয়ত অহেতুক দৌড়ানোর, কোথাও বা প্রকাশিত কারণেই খুঁড়িয়ে চলার চিহ্ন ফুটেছে। কিন্তু জিনিসটা মেকী নয়!

এর দুটো কারণ : এক, নজরুলের ছিল একটা নিজস্ব রাজনীতিক জীবন-দর্শন, দেশকে, সমাজকে, মানুষকে, যার প্রেরণায় তিনি ছোট্ট বেলা থেকে সত্য রূপে দেখতে শিখেছিলেন। আর তাঁর ছিল একটা

সহজাত কবি-ধর্ম, যা অতি অধ্যয়ন ও চিন্তনের চাপে আবিল হতে পারেনি।

এই দুইয়ের বর্গফলরূপেই তাঁর লেখায় এসেছিল যেমন পর্যাপ্ত মানবাত্মবোধ ; তেমনি পর্যাপ্ত পৌরুষ ও প্রাণোচ্ছলতা।

হয়ত তাঁর জোর ও দুর্বলতা দুইয়েরই মূল এখানে। তবু এই ছিল তাঁর বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্বের জন্যেই যদিও বয়সের হিসাবে তিনি মোহিতলাল ও যতীন সেনগুপ্তের প্রায় গা-ঘেঁষা ছিলেন, কিন্তু মনোধর্মের হিসাবে ছিলেন আমাদের সহযাত্রী। চুপি চুপি বলি, নজরুল মার্ক্সবাদ পড়ে রপ্ত করেন নি, কিন্তু মননশীলতায় তিনি ছিলেন প্রায় মার্ক্সপন্থী। অবশ্য কবি নজরুল।

আগেই বলেছি, এই কবি নজরুলই আমার কাছে সত্যিকার নজরুল। সেই সময়ের এক জন্মতিথি উপলক্ষে আমি যে কবিতা লিখেছিলাম তাঁর উদ্দেশে, সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানেও আমার বিচারে সেটাই প্রকৃত নজরুল-প্রশস্তি, কারণ তারপরের মানুষটিকে আমি আর দেখিনি আজকের যে নজরুল তাঁকে তাই আমি চিনিই না!

নজরুল-স্মৃতিকথা

জসীমউদ্দীন

তখন নজরুল থাকিতেন কলেজ ষ্ট্রীটের বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য-সমিতির অফিসে। গিয়া দেখি, কবি বারান্দায় বসিয়া কি লিখিতেছেন। আমার খবর পাইয়া তিনি লেখা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলাম, "আপনি লিখছিলেন, আগে আপনার লেখা শেষ করুন, পরে আপনার সঙ্গে আলাপ করব। আমি আপেক্ষা করছি।" কবি তাঁহার পূর্ব-লেখায় মনোনিবেশ করিলেন। আমি লেখন-রত কবিকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কবির সমস্ত অবয়বে কী যেন এক মধুর মোহ মিশিয়া আছে। দুইটি বড় বড় চোখ শিশুর মত সরল। ঘরের সমস্ত পরিবেশ নিরীক্ষণ করিয়া আমার ইহা মনে হইল, এত কষ্টের তিনটি পয়সা খরচ করিয়া কিস্তি-টুপিটি না কিনিলেও চলিত। কবির নিজের পোশাকেও কোন টুপি-আচকান-পায়জামার গন্ধ পাইলাম না।

অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহার লেখা শেষ করিয়া আমার নিকট চলিয়া আসিলেন। আমি অর্নুরোধ করিলাম, কি লিখেছেন আগে আমাকে পড়ে শোনান।

হার-মানা হার পরাই তোমার গলে....ইত্যাদি—

কবি-কণ্ঠের সেই মধুর স্বর এখনো কানে লাগিয়া আছে। কবিকে আমি আমার কবিতার খাতাখানি পড়িতে দিলাম। কবি দুই-একটি কবিতা পড়িয়াই খুব উচ্ছুসিত হইয়া উঠিলেন। আমার কবিতার খাতা মাথায় লইয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। আমার রচনার যে স্থানে কিছুটা বাকপটুত্ব ছিল, সেই লাইনগুলি বারবার আওড়াইতে লাগিলেন।

এমন সময় বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয় কবির সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তখন বিশ্বপতিবাবুর 'ঘরের ডাক' নামক উপন্যাস প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে। দুই বন্ধুতে বহু রকমের আলাপ হইল। কবি তাঁহার বহু কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। সেইদিন কবির মুখে তাঁহার 'পলাতকা' কবিতাটির আবৃত্তি বড়ই ভাল লাগিয়াছিল ঃ

আচমকা কোন্ শশক-শিশু চমকে ডেকে যায়,
ওরে আয়—
আয়রে বনের চপল চখা,
ওরে আমার পলাতকা!
ধানের শীষে শ্যামার শিষে
যাদুমণি বল সে কিসে
তোরে কে পিয়াল সবুজ স্নেহের কাঁচা বিষে রে!

এই কবিতার অনুপ্রাস-ধ্বনি আমাকে বড়ই আকর্ষণ করিয়াছিল। আজ পরিণত বয়সে বুঝিতে পারিতেছি, কবিতার মধ্যে যে করুণ সুরটি ফুটাইয়া তুলিতে কবি চেষ্টা করিয়াছেন অনুপ্রাস বরঞ্চ তাহাকে কতকটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না, নজরুলের বয়স তখন খুবই অল্প।

গল্প-গুজব শেষ হইলে কবি আমাকে বলিলেন, "আপনার কবিতার খাতা রেখে যান। আমি দুপুরের মধ্যে সমস্ত পড়ে শেষ করব। আপনি চারটার সময় আসবেন।"

কবির নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু কবির ব্যক্তিত্ব আর স্নেহ-মধুর ব্যবহার আমার অবচেতন মনে কাজ করিতে লাগিল। কোন্ অশরীরী ফেরেস্তা যেন আমার মনের বীণার তারে তাহার কোমল অঙ্গুলি রাখিয়া অপূর্ব সুর-লহরীর বিস্তার করিতে লাগিল। তাহার প্রভাবে সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি, এমন কি, কলিকাতার নোংরা বস্তি গাড়ি-ঘোড়া-ট্রামও আমার কাছে অপূর্ব বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

চারিটা না বাজিতেই কবির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কবি আমারই কবিতার খাতাখানা লইয়া অতি মনোযোগের সহিত পড়িতেছেন। খাতা হইতে মুখ তুলিয়া সহাস্যে তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। অতি মধুর স্নেহে বলিলেন, "তোমাব কবিতার মধ্যে যেগুলি আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে, আমি দাগ দিয়ে রেখেছি। এগুলি নকল করে তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিও। আমি কলকাতার মাসিকপত্রগুলিতে প্রকাশ করব।"

এমন সময় কবির কয়েকজন বন্ধু কবির সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। কবি তাহাদিগকে আমার কয়টি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। বন্ধুবা আমার কবিতা শোনার চাইতে কবিকে কোথাও লইয়া যাইবার জন্য মনোযোগী ছিলেন। কবি হাবিলদারের পোশাক পরিতে পরিতে গান গাহিয়া উচ্চ হাস্যধ্বনি করিয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া নিজের প্রাণ-চাঞ্চল্যের প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি কবির নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম।

কার্তিকদার আড্ডায় আসিয়া দেখি, তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। আমারই মতন জনৈক পথে-কুড়ান ভাই তাঁহার বাক্স হইতে টাকাপয়সা যাহা কিছু ছিল, সমস্ত লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। আমার কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। এই লোকটি আমাদের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করিতেনঃ নিজে অভুক্ত থাকিয়া, কতদিন দেখিয়াছি, এমনই পথে-পাওয়া তার কোন অনাহারী ভাইকে খাওয়াইতেছেন। এই কি তার প্রতিদান!

আমি দেশে চলিয়া যাইব বলিতে কার্তিকদা খুশী হইলেন। আমাকে বলিলেন, "তুমি দেশে গিয়ে পড়াশোনা কর। মানুষ হয়ে আবার কলকাতা এসো। দেখবে, সবাই তোমায় আদর করবে। আমিও তোমার মত দেশে গিয়ে পড়াশোনা করতাম, লজ্জায় যেতে পারছি না। যে সব ছাত্র আমার মত বিদ্যালয়ের গোলামখানা ছেড়ে আসেনি, তাদের কত গালি দিয়েছি; টিটকারী

করে বক্তৃতা দিয়েছি। আবার তাদের মধ্যে কোন্ মুখে ফিরে যাব ?”

বিদায় লইবার সময় আমার মাদুরখানা কার্তিকদাকে দিয়া আসিলাম, কার্তিকদা তাহা বিনা দামে কিছুতেই লইলেন না, তিনি জোর করিয়া আমার পকেটে মাদুরের দামটা দিয়া দিলেন। স্টেশনে আসিয়া আমার টিকিট খরিদ করিয়া দিলেন। বিদায় লইয়া আসিবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন, “জসীম, যখন যেখানেই থাকবি, মনে রাখিস—তোর এই কার্তিকদার মনে তোর আসনটা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমার জীবন হয়তো এইভাবেই নষ্ট হয়ে যাবে। পড়াশোনা করে মানুষ হবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা জীবনে ঘটবে না। নেতাদের কথায় কলেজ ছেড়ে যে ভুল করেছি, সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে হয়তো সারা জীবন করতে হবে। কিন্তু তোর জীবনে এই ভুল সংশোধন করার সুযোগ হল ; তুই যেন বড় হয়ে তোর কার্তিকদাকে ভুলে যাসনে। নিশ্চয়ই তুই একজন বড় কবি হতে পারবি। তখন আমাদের কথা মনে রাখিস।”

আমি অশ্রুসজল নয়নে বলিলাম, “কার্তিকদা, তোমাকে কোনোদিন ভুলব না। ভাল কাজ করলে সেই কাজে বোনা বীজের মত মানুষের মনে অঙ্কুর জন্মাতে থাকে। হয়তো সকলের অন্তরে সেই বীজ হতে অঙ্কুর হয় না। কিন্তু একথা মনে রাখবে, ভাল কাজ বৃথা যায় না। তোমার কথা এই দূরদেশী ছোট ভাইটির মনে চিরকাল জাগ্রত থাকবে।”

তখনকার কিশোর বয়সে এইসব কথা তেমন করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারিয়াছিলাম কিনা মনে নাই। কিন্তু আজও আমার মনের গহন কোণে কার্তিকদার সৌম্য মূর্তি চির-উজ্জ্বল হইয়া আছে। এতটুকুও ম্লান হয় নাই। দেশে ফিরিয়া আসিয়া কার্তিকদার কাছে পত্র লিখিয়াছিলাম। কোন উত্তর পাই নাই। হয়তো তিনি তখন অন্যত্র বাসা বদল করিয়াছেন। তারপর কতজনের কাছে কার্তিকদার

অনুসন্ধান করিয়াছি: কেহ তাঁহার খবর বলিতে পারে নাই। আজ আমার কিঞ্চিৎ কবিখ্যাতি হইয়াছে। আমার বইগুলি পড়িলে কার্তিকদা কত সুখী হইতেন! বঙ্গবিভাগের পর তিনি কোথায় গিয়াছেন, কে জানে! হয়তো অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে লইয়া তিনি কোন সুদূর পশ্চিম অঞ্চলে দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছেন।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, আমার মা আমার জন্য চিন্তা করিয়া শুকাইয়া গিয়াছেন। পিতা নানাস্থানে আমার খোঁজখবর লইয়া অস্থির হইয়াছেন। আজীবন মাস্টারী করিয়া ছেলেদের মনোবিজ্ঞান তাঁর ভালভাবেই জানা ছিল। তিনি জানিতেন চৌদ্দ-পনব বৎসরের ছেলেরা এমনি করিয়া বাড়ি হইতে পলাইয়া যায়; আবার ফিরিয়া আসে। সেইজন্য তিনি আমাব ইস্কুলের বেতন ঠিকমত দিয়া আসিতেছিলেন।

মা আমাকে সামনে বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। বাড়ির আম সেই কবে পাকিয়াছিল তাহা অতি যত্নে আমার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। অর্ধেক পচিয়া গিয়াছে তবু ছোট ভাই-বোনদের খাইতে দেন নাই, আমি আসলে খাইব বলিয়া।

আবার ইস্কুলে যাইতে লাগিলাম। নজরুল ইসলাম সাহেবের নিকট কবিতার নকল পাঠাইয়া সুদীর্ঘ পত্র লিখিলাম। কবির নিকট হইতে কবিতাব মতোই সুন্দর উত্তর আসিল। কবি আমাকে লিখলেন—

"ভাই শিশুকবি, তোমার কবিতা পেয়ে সুখী হলুম। আমি দখিন হাওয়া। ফুল ফুটিয়ে যাওয়া আমার কাজ। তোমাদের মত শিশু-কুসুমগুলিকে যদি আমি উৎসাহ দিয়ে আদর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারি, সেই হবে আমার বড় কাজ। তারপর আমি বিদায় নিয়ে চলে যাব আমার হিমগিরির গহন বিবরে।"

কবির নিকট হইতে এরূপ চার-পাঁচখানি পত্র পাইয়াছিলাম।

তাহা সেকালের অতি উৎসাহের দিনে বন্ধুবান্ধবদের দেখাইতে দেখাইতে হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিছুদিন পরে 'মোসলেম ভারতে' যে সংখ্যায় কবির বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সংখ্যায় 'মিলন-গান' নামে আরও একটি কবিতা ছাপা হইয়াছিল। চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত 'সাধনা' পত্রিকাতেও আমার দুই-তিনটি কবিতা ছাপা হয়। ইহা সবই কবির চেষ্টায়। আজও ভাবিয়া বিস্ময় লাগে, তখন কী-ই বা এমন লিখিতাম। কিন্তু সেই অখ্যাত অস্ফুট কিশোর-কবিকে তিনি কতই না উৎসাহ দিয়েছিলেন।

তারপর বহুদিন কবির কোন চিঠি পাই নাই। ইনাইয়া-বিনাইয়া কবিকে কত কী লিখিয়াছি, কবি নিরুত্তর। হঠাৎ একখানি পত্র পাইলাম, কবি আমাকে ফরিদপুরের অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার নরেন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্রবধূ এবং তাঁর নাতি-নাতকুড়দের বিষয়ে সমস্ত খবর লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। নরেন্দ্রবাবুর এক নাতি আমারই সহপাঠী ছিল। তাহার সঙ্গে গিয়া তাহার মায়ের সঙ্গে দেখা করিলাম। ভদ্রমহিলা আমাকে আপন ছেলের মতই গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহাকে মাসীমা বলিয়া ডাকিলাম। তাঁহাদের বাসায় গিয়া শুনিতে পাইলাম, মাসীমার বড় বোন বিরজাসুন্দরী দেবীকে কবি মা বলিয়া ডাকেন। কবির বিষয়ে তিনি আরও অনেক কথা বলিলেন। সেই হইতে মাসীমা হইলেন কবির সঙ্গে আমার পরিচয়ের নূতন যোগসূত্র। কবি আমাকে পত্র লিখিতেন না। কিন্তু মাসীমার বড় বোন বিরজাসুন্দরী দেবীর নিকট হইতে নিয়মিত পত্র পাইতেন। সেই সব পত্র শুধু নজরুলের কথাতেই ভর্তি থাকিত।

মাসীমা কবির প্রায় অধিকাংশ কবিতাই মুখস্থ বলিতে পারিতেন। নজরুলের প্রশংসা যেদিন খুব বেশি করিতাম, সেদিন মাসীমা আমাকে না খাওয়াইয়া কিছুতেই আসিতে দিতেন না। মাসীমার গৃহটি ছিল রক্ষণশীল হিন্দু-পরিবারের। আজ ভাবিয়া বিস্ময় মনে হয়, কি করিয়া

একজন মুসলিম কবির আরবী-ফার্‌সী মিশ্রিত কবিতাগুলি গৃহ-বন্দিনী একটি হিন্দু-মহিলার মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল।

নজরুলের রচিত 'মহরম' কবিতাটি কতবার আমি মাসীমাকে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। মাসীমার আবৃত্তি ছিল বড় মধুর। তাঁর চেহারাটি প্রতিমার মত ঝকমক করিত। একবার আমি নজরুলের উপর একটি কবিতা রচনা করিয়া মাসীমাকে শুনাইয়াছিলাম। সেদিন মাসীমা আমাকে পিঠা খাওয়াইয়াছিলেন। সেই কবিতার ক'টি লাইন মনে আছে—

নজরুল ইসলাম!
তছলিম ঐ নাম।
বাংলার বাদলার ঘনঘোর ঝঞ্ঝায়,
দামামার দমদম লৌহময় গান গায়;
কাঁপাইয়া সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষ,
আলোড়িত আসমান ধরণীর বক্ষ;
সেই কালে মহাবীর তোমারে যে হেরিলাম,
নজরুল ইসলাম।

নজরুল কাব্য-প্রতিভার যবনিকার অন্তরালে আমার এই মাসীমার এবং তার বোনদের স্নেহ-সুধার দান যে কতখানি, তাহা কেহই কোনদিন জানিতে পারিবে না। বৃক্ষ যখন শাখাবাহু বিস্তার করিয়া ফুলে ফুলে সমস্ত ধরণীকে সজ্জিত করে, তখন সকলের দৃষ্টি সেই বৃক্ষটির উপর পড়ে। সে গোপন মাটির স্তন্যধারা সেই বৃক্ষটিকে দিনে দিনে জীবনরস দান করে, কে তাহার সন্ধান রাখে। কবি কিন্তু তাঁর জীবনে ইহাদের ভোলেন নাই। মাসীমাকে কবি একখানি সুন্দর শাড়ি উপহার দিয়াছিলেন। মৃত্যুর আগে মাসীমা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় যেন তাঁর মৃতদেহ সেই শাড়িখানি দিয়া আবৃত করা হয়।

মাসীমার বড় বোন বিরজাসুন্দরী দেবী অশ্রুসজল নয়নে আমাকে

বলিয়াছিলেন, "তোমার মাসীমার সেই শেষ ইচ্ছা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছিল।"

বহুদিন কবির চিঠি পাই না। হঠাৎ এক পত্র পাইলাম, কবি 'ধূমকেতু' নাম দিয়া একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিতেছেন। তিনি আমাকে লিখিয়াছেন 'ধূমকেতু'র গ্রাহক সংগ্রহ করিতে। ছেলেমানুষ আমি—আমার কথায় কে 'ধূমকেতু'র গ্রাহক হইবে? সুফী মোতাহার হোসেন অধুনা কবিখ্যাতিসম্পন্ন; সে তখন জেলা ইস্কুলের বোর্ডিংএ থাকিয়া পড়াশুনা করিত। সে আমার কথায় 'ধূমকেতু'র গ্রাহক হইল। তখন দেশে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছিল। দেশের নেতারা পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া রক্তপাতহীন আন্দোলনের নজিব খুঁজিতেছিলেন। নজরুলের 'ধূমকেতু' কিন্তু রক্তময় বিপ্লববাদেব অগ্নি-অক্ষর লইয়া বাহিব হইল। প্রত্যেক সংখ্যায় নজরুল যে অগ্নি-উদ্গারী সম্পাদকীয় লিখিতেন, তাহা পড়িয়া আমাদের ধমনীতে রক্তপ্রবাহ ছুটিত। সেই সময়ে বিপ্লবীরা বৃটিশ গভর্নমেণ্টেব বিরুদ্ধে যে মারণযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন নজরুল-সাহিত্য তাহাতে অনেকখানি ইন্ধন যোগাইয়াছিল। তাঁহার সেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি আমরা বার বার পড়িয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিতাম। একটি প্রবন্ধের নাম ছিল 'ম্যায় ভুখা হুঁ', ভারতমাতা অন্তরীক্ষ হইতে বলিতেছেন, "আমি রক্ত চাই, নিজ সন্তানের রক্ত দিয়া তিমির রাত্রির বুকে নব-প্রভাতের পদরেখা অঙ্কিত করিব।" 'ধূমকেতু'র মধ্যে যে সব খবব বাহির হইত, তাহার মধ্যেও কবির এই সুরটির রেশ পাওয়া যাইত।

'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত একটি কবিতার জন্য কবিকে গ্রেপ্তার করা হইল। বিচারে কবির জেল হইল। জেলের নিয়ম-শৃঙ্খলা না মানার জন্য কর্তৃপক্ষ কবির প্রতি কঠোর হইয়া উঠিলেন। কবি অনশন আরম্ভ করিলেন। কবির অনশন যখন তিরিশ দিনে পরিণত হইল, তখন সারা দেশ কবির জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ হইতে শুরু

করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত সকলেই কবিকে অনাহার-ব্রত ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিলেন। কবি নিজ সঙ্কল্পে অটল। তখনকার দিনে বাঙালী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে কবির অনশন উপলক্ষে গভর্নমেন্টের কার্যের প্রতিবাদে কলিকাতায় বিরাট সভা হইল। সেই সভায় হাজার হাজার লোক কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইলেন। দেশবন্ধু তাঁহার উদাত্ত ভাষায় কবির মহাপ্রতিভার উচ্চ প্রশংসা করিলেন। বাংলাদেশের খবরের কাগজগুলিতে প্রতিদিন নজরুলের কাব্য-মহিমা বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নজরুলের বিজয়-বৈজয়ন্তীর কী-ই না যুগ গিয়াছে! কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, নজরুল রবীন্দ্রনাথের চাইতেও বড় কবি।

অনশন-ব্রত কবির জীবনে একটা মহা-ঘটনা। যাঁহারা কবিকে জানেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, কবি সংযম কাহাকে বলে জানিতেন না। রাজনৈতিক বহু নেতা এরূপ বহুবার অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন ত্যাগে অভ্যস্ত। কবির মত একজন প্রাণচঞ্চল লোক কি করিয়া জেলের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা এক আশ্চর্য ঘটনা। দিনের পর দিন এইরূপ অনশন একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নজরুল-জীবনের এই সময়টি এক মহা-মহিমার যুগ। কোন অন্যায়ের সঙ্গেই মিটমাট করিয়া চলিবার পাত্র তিনি ছিলেন না। সেই সময়ে দেখিয়াছি, কত অভাব অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার দিন গিয়াছে। যদি একটু নরম হইয়া চলিতেন, যদি লোকের চাহিদা মত কিছু লিখিতেন, তবে সম্মানের আর সম্পদের সিংহাসন আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইত।

তাহার ভিতরে কবি এবং দেশপ্রেমিক একসঙ্গে বাসা বাঁধিয়াছিল। আদর্শবাদী নেতা এবং সাহিত্যিকের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল তাঁহার জীবনে। চল্লিশ দিন অনশনের পর কবি অন্ন গ্রহণ করিলেন। তারপর জেল হইতে বাহির হইয়া আসিলে চারিদিকে কবির জয়-ডঙ্কা

বাজিতে লাগিল। আমার মত শিশু-কবির ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সেই মহা কলরব ভেদ করিয়া কবির নিকট পৌঁছিতে পারিল না।

আমি তখন সবে আই. এ. ক্লাসে উঠিয়াছি। আমার কবিতার রচনা-রীতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্বে রবীন্দ্র-রচনার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিতাম, বহু কাগজে তাহা ছাপা হইয়াছে। এমন কী 'প্রবাসী' কাগজে পর্যন্ত আমার লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রাম্য-জীবন লইয়া গ্রাম্য-ভাষায় যখন কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম, কেহই তাহা পছন্দ করিল না। কাগজের সম্পাদকেরা আমার লেখা পাওয়া মাত্র ফেরৎ পাঠাইয়া দিতেন। সবটুকু হয়তো পড়িয়াও দেখিতেন না। সেই সময়ে আমার মনে যে কি দারুণ দুঃখ হইত তাহা বর্ণনার অতীত।

একবার গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলায় আমাদের গ্রামের মাঠ দিয়া চলিয়াছি, এমন সময় পিয়ন আসিয়া 'ভারতবর্ষ' হইতে অমনোনীত 'বাপের বাড়ীর কথা' নামক কবিতাটি ফেরত দিয়া গেল। পিয়ন চলিয়া গেলে আমি মনোদুঃখে সেই ঢেলা-ভরা চষা-ক্ষেতের মধ্যে লুটাইয়া পড়িলাম। কিন্তু চারিদিক হইতে যতই অবহেলা আসুক না কেন আমার মনের মধ্যে জোর ছিল। আমার মনে ভরসা ছিল, আমি যাদের কথা লিখিতেছি, আর ভালো করিয়া লিখিতে পারিলে নিশ্চয়ই দেশ একদিন আমার কবিতার আদর করিবে।

সেই সময়ে আমার কেবলই মনে হইত, একবার যদি কবি নজরুলের সঙ্গে দেখা করিতে পারি, নিশ্চয় তিনি আমার কবিতা পছন্দ করিবেন। গ্রাম্য-জীবন লইয়া কবিতা লিখিতে লিখিতে আমি গ্রাম্য-কবিদের রচিত গানগুলির অনুসন্ধান করিতেছিলাম। আমার সংগৃহীত কিছু গ্রাম্য-গান দেখিয়া পরলোকগত সাহিত্যিক যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় আমাকে শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা করিতে পরামর্শ দেন।

কংগ্রেস-অফিসের সাময়িক স্বেচ্ছাসেবক হইয়া তাহাদের জন্য

অর্থ সংগ্রহ করিতে করিতে আমি কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হই। পথের যত ধূলি আর গুঁড়া-কয়লা রজক গৃহ-সম্পর্কহীন আমার শ্রীঅঙ্গের মোটা খদ্দরে, কিস্তি-নৌকার মত চর্ম-পাদুকাজোড়ায়, এবং তৈলহীন চুলের উপর এমনভাবে আশ্রয় লইয়াছিল যে তাহার আবরণীর তল ভেদ করিয়া আমার পূর্বপরিচিত কেহ আমাকে সহজে আবিষ্কার করিতে পরিত না।

সুবিস্তৃত জন-অরণ্য কলিকাতায় আমি কাহাকেও চিনি না। কোথায় গিয়া আশ্রয় পাইব? কে আমাকে থাকিবার জায়গা দিবে। যদি কবি নজরুলের সন্ধান পাই, তাঁর স্নেহের শিশু কবিকে নিশ্চয় তিনি অবহেলা করিবেন না। মুসলিম পাবলিশিং হাউসে আসিয়া আফজল মিঞার কাছে কবির সন্ধান লইলাম। আফজল মিঞা বলিলেন, "অপেক্ষা করুন। কবি একটু পরেই এখানে আসবেন।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝড়ের মত কবি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আফজল সাহেব বলিলেন, "জসীমউদ্দীন এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

"কই জসীমউদ্দীন?" বলিয়া কবি এদিক-ওদিক চাহিলেন। আফজল সাহেব আমাকে দেখাইয়া দিলেন। আমি কবিকে সালাম করিলাম।

কবি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কই, তোমার লেখা কোথাও তো দেখিনি?" আমি কবির নিকট আমার কবিতার খাতাখানা আগাইয়া দিতে গেলাম। কিন্তু কবি তাঁহার গুণগ্রাহীদের দ্বারা এমনই পরিবৃত হইলেন যে আমি আর ব্যূহভেদ করিয়া কবির নিকটে পৌঁছিতে পারিলাম না।

অল্পক্ষণ পরেই কবি ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "আমাকে এখন হুগলী যেতে হবে।"

আগাইয়া গিয়া বলিলাম, "আমি বহুদূর থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

কবি আমাকে বলিলেন, "একদিন হুগলীতে আমার ওখানে এসো। আজ আমি যাই।"

এই বলিয়া কবি একটি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। আমিও কবির সঙ্গে সেই ট্যাক্সিতে গিয়া উঠিলাম। কবির প্রকাশক মৈনুদ্দিন হুসায়েন সাহেবও কবির সঙ্গে ছিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম ট্যাক্সিতে বসিয়া কবির সঙ্গে দু-চারটি কথা বলিতে পারিব। কিন্তু মৈনুদ্দিন সাহেবই সব সময় কবির সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। আমি মৈনুদ্দিন সাহেবকে বলিলাম, "আপনি তো কলকাতায় থাকেন, সব সময় কবির সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। আমাকে একটু কবির সঙ্গে কথা বলতে দিন।"

কবি কহিলেন, "বল বল, তোমার কি কথা।"

আমি আর কি উত্তর করিব। কবি আবার মৈনুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। ট্যাক্সি আসিয়া হাওড়ায় থামিল। কবি তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি হইতে নামিয়া রেলগাড়িতে গিয়া উপবেশন করিলেন। রাশি রাশি ধূম উদ্গীরণ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া গাড়ি চলিয়া গেল। আমি স্তব্ধ হইয়া প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া রহিলাম! গাড়ির চাকা যেন আমার বুকের উপর কঠিন আঘাত করিয়া চলিতে লাগিল।

এখন আমি যাই কোথায়—কাহার নিকটে গিয়া আশ্রয় লই? ফরিদপুরের এক ভদ্রলোক হ্যারিসন রোডে ডজ-ফার্মেসীতে কাজ করিতেন। তাঁহার সন্ধানে বাহির হইলাম। কিন্তু হ্যারিসন রোডের ডজ-ফার্মেসী কোথায় আমি জানি না। একে তো ট্রেন-ভ্রমণে ক্লান্ত, তার উপর সারাদিন কিছু আহার হয় নাই। হাওড়া হইতে শিয়ালদহ পর্যন্ত রাস্তার এপারে-ওপারে তিন-চারবার ঘুরিয়া ডজ-ফার্মেসীর সন্ধান পাইলাম। ফার্মেসীতে কংগ্রেসের জন্য সংগৃহীত টাকার বাক্সটি রাখিয়া ফুটপাতের উপর শুইয়া পড়িলাম। তখন আমি এত ক্লান্ত যে সারাদিনের অনাহারের পর খাওয়ার কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুল

এম. আবত্নুর রহমান

"রবি দেখে পেয়েছে যে আলোক প্রথম,
তারি মাঝে লভে রবি প্রথম জনম!"—নজরুল।

বঙ্গীয় ১৩৬৮ সাল। সারা জাহান্ জুড়ে রবীন্দ্র শততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হ'ল। বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে পুনর্বার কবি-শ্রেষ্ঠ ঋষি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার এক নবতম অধ্যায় হ'ল সংযোজন। মহাকবির এই জন্মবার্ষিকী ত্নুনিয়ার সাহিত্যিক-শিল্পী এবং গুণীজনের 'দীলে' দিয়ে গেল নূতন ক'রে একটা প্রচণ্ড দোলা। ভারত-মাতার প্রাণে জাগলো পুলক-শিহরণ। কিন্তু রবীন্দ্র-ভক্ত এবং রবীন্দ্র-শিষ্য বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম এই মহোৎসবে কোন অংশই গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি জানতেই পারলেন না, তাঁর গুরুদেরের শত-বর্ষ-পূর্তি উৎসব আয়োজনের কথা। এমনই মূর্ছাহত হয়ে আছে নজরুলের কবি-মানস। তিনি গত ত্নু'যুগ ধ'রে অসুস্থ, তাঁর কণ্ঠ নীরব, লেখনী তাঁর স্তব্ধ। অসুস্থ হবার সময় পর্যন্ত তিনি তাঁর গুরুদেবের সম্পর্কে লিখেছেন বহু কবিতা এবং গান। "কিশোর রবি", "রবির জন্মতিথি", অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি" এবং "রবিহারা" প্রভৃতি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি রচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুল যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন, আজও তা' সুরভিত ক'রে রেখেছে বঙ্গ-ভারতীর পবিত্র বেদীমঞ্চ।

নজরুলের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন—বিশ্বকবিসম্রাট, ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি, শক্তিধর নেতা, মহাপুরুষ। বিদ্রোহী কবি বলেছেন:

শুধু বেণু আর বীণা লয়ে তুমি আস নাই ধরা 'পরে—
দেখেছি শঙ্খ, চক্র, বিষাণ, বজ্র তোমার করে।

... .

জানি জানি তব দক্ষিণ করে অনন্ত শ্রী আছে,
দক্ষিণা দাও ব'লে তাই ওরা এসেছে তোমার কাছে।
হে রবি, তোমায় নারায়ণরূপে এ ভারত পূজা করে,
যাইবার আগে জানাইয়া তুমি যাও সেই রূপ ধরে।
... ... (কিশোর রবি)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-গগনে মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত যখন ভাস্বর হয়ে উজ্জ্বল আলো বিকীরণ করছিলেন, তখন অকস্মাৎ নজরুলের আবির্ভাব—'ধূমকেতু'র মত। নজরুলের ভাষায়ঃ

ধ্যান-শান্ত মৌন তব কাব্য-রবি-লোকে—
সহসা আসিনু আমি ধূমকেতু সম,
রুদ্রের দূরন্ত দূত, ছিন্ন হর-জটা—
কক্ষচ্যুত উপগ্রহ। ....(অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি)

উপরি-উদ্ধৃত কবিতা লিখবার অনেক আগেকার কথা। ১৯১০ সালের ঘটনা। নজরুল তখন নবীন কিশোর। ময়মনসিংহ জেলার দবিরামপুব স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র। সবেমাত্র তাঁর পরিচয় শুরু হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে। পাঠ্য-পুস্তকে সঙ্কলিত কবি-গুরুর কবিতা ছাড়া তাঁর স্বল্প সংখ্যক কবিতা তখন নজরুল পাঠ করেছেন। যে কয়টি পড়েছেন, কণ্ঠস্থ করেছেন। দরিরামপুর হাই স্কুলের পরবর্তীকালের প্রধান-শিক্ষক শ্রীমহিমচন্দ্র খাসনবিশ তখন সহকারী শিক্ষক হয়ে সবেমাত্র স্কুলে যোগদান করেছেন। স্কুলের ছাত্রদেরকে নিয়ে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। উক্ত অনুষ্ঠানে বিনা মহড়ায় নজরুল রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য" এবং "দুই বিঘা জমি" কবিতা আবৃত্তি ক'রে শিক্ষকগণের নিকট হতে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিলেন। কবিগুরুর কবিতা অনেক ছাত্রই আবৃত্তি করে, ইহা এমন কিছু তাজ্জবের ব্যাপার নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইহাই উল্লেখযোগ্য যে, নজরুলের আবৃত্তি শুধু সুন্দরই হয়নি,

উল্লিখিত কবিতার বাক্য, ছন্দ ও সুর যেন নজরুলের কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠেছিল; তাঁর উচ্চারণ-ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছিল অপরূপ মাধুর্য ও চমৎকারিত্ব। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের প্রতি ছোট হতেই ছিল নজরুলের অন্তরের আকর্ষণ, যাকে বলে 'দরদ্'। সেই "দরদ্মন্দ" (sincere regard) পাঠকরূপেই কিশোর নজরুলের রবীন্দ্রকাব্য-পাঠ শুরু।

উক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পরের কথা। নজরুল তখন শিয়ারসোল-রাজ হাই স্কুলের ছাত্র। বন্ধু মহলে, মজলিসে তিনি আবৃত্তি করেন—রবীন্দ্রনাথের কবিতা, মাঠে-ঘাটে গেয়ে বেড়ান কবিগুরুর গান। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় নজরুল পঞ্চমুখ। তাঁর নিন্দা শুনলে নজরুল রাগে আগুন হয়ে ওঠেন, ঝগড়া করেন কবি-নিন্দুকের সঙ্গে। একদিন তাঁর এক বন্ধু খেলার মাঠে কবিগুরুর নিন্দা করতেই নজরুল "রুখে" উঠেন। কথা কাটাকাটি হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত হ'ল মাথা-ফাটাফাটি। নজরুল উত্তেজিত ও বেসামাল হয়ে টুক্রো বাঁশ দিয়ে আঘাত করেন ছেলেটিকে; তার মাথা ও কপাল কেটে গিয়ে রক্ত পড়ে। এই নিয়ে হয়েছিল মোকর্দমা বর্ধমান জেলার আসানসোল কোর্টে, দণ্ড-বিধি আইনের ৩৩২ ধারায়। মামলা অবশ্য বেশীদিন চলেনি। আপোষ হয়ে গিয়েছিল। আবার ভাবও হয়েছিল ফরিয়াদীর সঙ্গে। নজরুলের কোন কোন জীবনীকার বলেছেন, বিচারে নজরুলের দণ্ড হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা আটক থাকতে হয়েছিল তাঁকে কোর্টে। এইরূপ আটক-থাকা দণ্ডকে আইনের ভাষায় Till rising of the Court সংক্ষেপে T.R.C বলে। নজরুল-জীবনী লেখকদের লিখিত এই ঘটনা সত্য নয়। নজরুলের দূর সম্পর্কীয় মামা অধুনা মৃত উকীল আজিজুর রহমান সাহেব বলেছেন —শুরুতেই উক্ত মোকর্দমা আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া দঃ বিঃ আইনের ৩৩২ ধারায় মামলা, সাধারণতঃ T.R.C. হয় না। কাজেই উকীল সাহেবের উক্তি সত্য বলে মনে হয়।

নজরুল যখন হুগলীতে বিদ্রোহী কবিরূপে খ্যাতনামা, সেই সময়ে উক্ত ভদ্রলোক হুগলীতে নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে এসে কপালের সেই কাটা দাগ দেখিয়ে বলেছিলেন, 'তোর হাতের জয়টিকা এখনও আমার কপালে আছে।' "কবি নজরুল" গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এই শোযোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

নজরুল প্রথম মহাযুদ্ধে গিয়েছিলেন উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়ে। করাচী সৈন্য-ব্যারাকেই বেশীদিন ছিলেন তিনি। সেখানে নজরুলের সঙ্গী ছিল কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বই আর মরমী কবি হাফিজের "দীওয়ানা"। যুদ্ধশেষে যখন কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁর গ্রন্থ-সম্পদের মধ্যে ছিল কবিগুরুর আর হাফিজের কেতাব আর খানকতক মাসিক পত্র-পত্রিকা। নজরুল তাঁর প্রাথমিক কবি-জীবনে সঙ্গীত রচনা করতেন না, তবে গান গাইতেন, মজলিসে — বৈঠকে সেকালের খ্যাতনামা গায়ক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সে গানও ছিল বিশুদ্ধ রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা বের হ'ল সাপ্তাহিক "বিজলী"তে। কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর একই সঙ্গে তাঁর ভাগ্যে জুটলো প্রচুর প্রশংসা এবং প্রভূত নিন্দা। 'বিদ্রোহী' ছাপার অক্ষরে বের হবার আগেই কবিগুরুর সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়েছিল। মাঝে মাঝে তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে যেতেন। 'বিদ্রোহী' ছাপা হবার পর খানকতক "বিজলী" নিয়ে তিনি গুরুদেবের কাছে গেলেন—উদ্দেশ্য কবিতাটি তাঁকে শোনানো এবং অভিমত সংগ্রহ। সৌভাগ্যক্রমে গুরুদেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। তিনি গুরুদেবের সম্মুখে না বসে, দাঁড়িয়ে কবিতাটি পাঠ করলেন। গুরুদেব নজরুলের কবিতা শুনে বললেন—'আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমার কবি-প্রতিভায় জগৎ আলোকিত হোক—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।' এই কাহিনীটি বিবৃত করেছেন, "বিজলী"র তৎকালীন

কর্মসচিব শ্রদ্ধেয় অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর "পুরানো কথা"য় (মাসিক বসুমতী, ১৩৬২, কার্তিক)। অপ্রত্যাশিতভাবে এই আশীর্বাদ পেয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে নজরুলের হৃদয় ভরে উঠলো, প্রণাম ক'রে তিনি ফিরে এলেন। ফিরে এলেন নূতন প্রেরণা, নবীন উৎসাহ এবং নব উদ্দীপনা নিয়ে। অনেক সময় বন্ধুদের কাছে তিনি ব্যক্ত করেছেন গুরুদেবের নিকট হ'তে পাওয়া তাঁর স্নেহসিক্ত আশীর্বাদের কথা ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে। তাঁর কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে সেদিনের সেই ঘটনা।

……বক্ষে ধরে তুমি
ললাট চুমিয়া মোরে করিলে আশিস্।—(অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি)

'বিদ্রোহী' কবিতা নজরুল ইসলামকে খ্যাতির উচ্চ শিখরে তুলে দিলো। সাহিত্য-রসিক জনগণের নিকট তিনি পরিচিত হলেন 'বিদ্রোহী' কবি বলে। অতঃপর গদ্য লেখার চেয়ে পদ্য লেখায় অধিকতর আগ্রহে মনঃসংযোগ করলেন তিনি।

নজরুল মনে-প্রাণে রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব ব'লে স্বীকার করেছেন এবং একখানি পত্রে একবারের জন্য হলেও নিজেকে 'মুসলিম রবীন্দ্রনাথ' ব'লে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ইহা যেমন সত্য, তেমনই ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, যুগপ্রবর্তক কবি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিহার ক'রে নজরুল তাঁর কবি-প্রতিভাকে ভিন্নধারায় ভিন্নপথে পরিচালিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে তিনি কোনদিন অস্বীকার করেন নি। বরঞ্চ তাঁর প্রদর্শিত পথকে শ্রেয়ঃ ব'লে শেষ পর্যন্ত স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তাই আমরা দেখি বিদ্রোহী কবির হাতে যে 'রণতূর্যে' অগ্নিক্ষরা, পাগল-করা এবং রক্ত-নাচানো নিনাদ ধ্বনিত হচ্ছিল, গুরুদেবের স্নেহস্পর্শে তাঁর 'আর হাতের বাঁশের বাঁশী' হতে অতঃপর বের হতে লাগলো মনোহারী মধুর ঝঙ্কার। নজরুল সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, বলেছেন—

হে রস-শেখর কবি, তব জন্মদিনে
আমি কয়ে যাব মোর জন্মকথা,
আনন্দ-সুন্দর তব মধুর পরশে—
অগ্নিগিরি গিরিমল্লিকার ফুলে ফুলে
ছেয়ে গেছে, জুড়ায়েছে সব জ্বালা।—(অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি)

যে বিদ্রোহী কবি একদিন 'ভৃগু ভগবান-বুকে' পদচিহ্ন এঁকে দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, সেই কবিই রবীন্দ্র স্নেহের স্পর্শে, শেষের দিকে সুন্দরের সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন, পরম প্রভুর চরণে নিঃশেষে নিবেদন করেছিলেন নিজেকে।

প্রভু আলো দাও আলো—
ঘুচুক ভয়ের ভ্রান্তি, জড়তা, ঘন নিরাশার কালো,
তুমিই শক্তি, ভক্তি ও প্রেম, জ্ঞান আনন্দ দাও—
কবুল কর এ প্রার্থনা, প্রভু কৃপা কর, ফিরে চাও।
– (আর কতদিন)

আর কিছু নয়, চির প্রেমময
তোমার ভিক্ষা চাই।
—(তোমারে ভিক্ষা দাও)

কবি নজরুল ইসলামের এই সকল কবিতা আমাদিগকে কবিগুরুর 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে' প্রভৃতি রচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কাজেই নজরুল-জীবনে রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ প্রভাব পড়েনি একথা বলা যাবে না, বরঞ্চ আমরা দেখতে পাই—কবিগুরু নজরুলকে তাঁর চলা-পথের যে দিক-নির্দেশ করেছিলেন —নজরুল তা মেনে নিয়েছিলেন। বিদ্রোহী কবি বলেছেন—

আমি জানি তব প্রেম আমার আগুন
নিভায়ে দিয়াছে সেথা কান্তি অনুরূপ।
মনে পড়ে বলেছিলে হেসে একদিন—
'তরবারি দিয়া তুমি চাঁচিতেছ দাড়ি'।

যে জ্যোতি করিতে পারে জ্যোতির্ময় ধরা—
সে জ্যোতিরে অগ্নি ক'রে হলে পুচ্ছকেতু।
—(অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি)

এ হল নজরুলের কবি-জীবনের শেষ পর্যায়ের কথা। নজরুল যখন তাঁর প্রাথমিক কবি-জীবনে একদিকে নিজের চরম দারিদ্র্য এবং অপর দিকে দেশমাতৃকার পরাধীনতার নিদারুণ লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, জনগণের নিকট যখন তিনি প্রিয়তম চারণ-কবি, সেই সময়ে তাঁর বন্ধুমহলের কেউ কেউ অনুযোগ করে বলেছিলেন— "যেমন বেরোয় রবির হাতে—সেই চিরকেলে বাণী কই কবি?" নজরুল দ্বিধাহীন চিত্তে তখনই তার জবাবে বলেছিলেন—

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী।

আমি চারণের বেশে দেশে দেশে ফিরি গান গেয়ে।

*　　　*　　　..

পরওয়া করিনা বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
—(আমার কৈফিয়ৎ)

চারণ-কবি নজরুল ইসলাম চেয়েছিলেন তাঁর গুরুদেব স্বাধীনতা-আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান, সক্রিয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দেশের আজাদী আন্দোলনকে যে তাঁর কবিতা ও গানে জোরদার করে তুলেছিলেন, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু সে আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর মত ও পথ ছিল ভিন্ন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও তিনি দেশের মুক্তি-সংগ্রামের আদর্শ ও নীতি নিয়ে সর্বাংশে একমত হতে পারেন নি। মুক্তি-আন্দোলনের মত ও পথের সঙ্গে গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর শিষ্য নজরুলের আদৌ মিল ছিল না। এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে ছিল প্রচুর ব্যবধান।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ নিখিল বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত ও জড়িত একটি বিরাট দেশ আর তাঁর দেশবাসী বিশ্ব-মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি মহান্ জাতি (Nation)। সকল দেশের সব মানুষের সঙ্গেই তাঁর মিতালী। কিন্তু নজরুলের স্বদেশ একান্তভাবে পরাধীন একটি নিপীড়িত দেশ, দেশবাসীরা তাঁর 'গোলামের জাত'। ভিন্ন দেশবাসীর বিশেষ করে যাঁরা তাঁর দেশবাসীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে, সেই জাতের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব করা চলে না, আর তাদেরকে এদেশে ঠাঁই দিতেও তিনি নারাজ। নজরুল তাঁর দেশে চারণ-কবি। আর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। কবিগুরু বলছেন—

আমি পৃথিবীর কবি
যেথা তার যত উঠে ধ্বনি,
আমার বাঁশীর সুরে
সাড়া তার জাগিবে তখনি।—(ঐক্যতান)

পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে
যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।—(ভারত-তীর্থ)

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে
তুমি দেখা দিলে কি বেশে,
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে—
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।—(স্বদেশ)

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী,
হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী,

পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে প্রেমহার হয় গাঁথা,
জনগণ ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
—(ভারত-ভাগ্য-বিধাতা)

রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতের নন, তিনি নিখিল বিশ্বের, সকল কওমের সকল মানুষের। কিন্তু নজরুল সকল শ্রেণীর সকল মানুষের কবি নন, তিনি উৎপীড়িত মানুষের কবি, বঞ্চিত মানবতার কবি, হোক সে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ। তিনি বলেছেন—

আমি গাহি তাহাদের গান
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
আমি নর-কবি গাহি সেই বেদে বেদুইনদের গান—
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব অভিযান।

* * *

ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে
যাহাদের কারাবাসে—
অতীত রাতের বন্দিনী ঊষা ঘুম টুটি ঐ হাসে।
- (আমি গাই তারি গান)

প্রার্থনা ক'রো যারা কেড়ে খায়
তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায়
তাদের সর্বনাশ।—(আমার কৈফিয়ৎ)

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না।
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।—(বিদ্রোহী)

গুরু এবং শিষ্য উভয় কবির জীবনাদর্শের মধ্যে ছিল ঢের ফারাক।

এজন্য প্রিয়-শিষ্যের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা গুরুদেবের পক্ষে নানা কারণে সম্ভবপর হয়নি। কেন হয়নি, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। তিনি বলেছেন—

এই স্বর-সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে ফাঁক।

*　　*　　*

পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবন-যাত্রার।—(ঐক্যতান)

গুরুদেব ইচ্ছা করলে এই বেড়াগুলি অপসারণ করতে পারেন এরূপ ধারণা ছিল নজরুলের। আর এজন্যই ছিল কবিগুরুর উপরে বিদ্রোহী কবির অভিমান এবং অনুযোগ। "আত্মশক্তি" পত্রিকায় গুরুদেবের বিরুদ্ধে প্রবন্ধও লিখেছিলেন তিনি। পিতার উপরে পুত্রের মত তিনি 'গোশা'ও করেছেন। কিন্তু তাতে তাঁর ভক্তি এবং শ্রদ্ধা এতটুকু হ্রাস পায়নি কোন দিন। গুরুদেবের নিকট বিনীত কণ্ঠে বার বার প্রার্থনা জানাতে, 'আর্জি' পেশ করতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। নজরুল বলেছেন—

ওগো ও পরম শক্তিমানের জ্যোতির্দীপ্ত রবি
সেই বিধাতার ভাণ্ডার লুটে নিয়ে যাও হেথা সবি,
যারা জড়, যারা নুড়ির মতন, নিত্য রস প্রবাহে—
ডুবিয়া থেকেও পাইল না রস, তারা তব কৃপা চাহে।
এই ক্ষুধাতুর উপবাসী চির নিপীড়িত জনগণে
ক্লৈব্য ভীতির গুহা হতে আন আনন্দ-নন্দনে।
ঊর্ধ্বের যারা তাহারা পাইল তোমার পরম দান—
নিম্নের যারা তাদের এবার করগো পরিত্রাণ।
মরে আছে যারা, তারা আজ তব অমৃত নাহি পায়
তোমার রুদ্র আঘাতে তাদের ঘুম যেন ভেঙে যায়।

(কিশোর রবি)

কাজী নজরুল ইসলাম "ধূমকেতু" নামে একখানি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন ১৯২২ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে। পত্রিকা প্রকাশের সব সরঞ্জাম-আয়োজন পূর্ণ। এমন সময় স্মরণ হল নজরুলের গুরুদেবকে। এ শুভ কর্মে চাই তাঁর আশীর্বাদ। সময় ছিল সঙ্কীর্ণ, তাই টেলিগ্রাম করলেন কবি-সম্রাটের নিকটে শান্তিনিকেতনে। আশা এবং আশঙ্কায় সময় গুণছেন, এমন সময় এসে পৌঁছালো গুরুদেবের আশীর্বাণী—

কাজী নজরুল ইসলাম

কল্যাণীয়েষু—

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গে-শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দে-রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ-চেতন।

২৪শে শ্রাবণ
১৩২৯ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই আশীর্বাণী ব্লক করে নিয়ে প্রত্যেক সংখ্যা "ধূমকেতু"তে ছাপাতে লাগলেন পত্রিকার সারথি নজরুল ইসলাম। ধূমকেতুর মাধ্যমে অগ্নিবর্ষণ শুরু করলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত হল তাঁর জেল। 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক সম্পাদকীয় কবিতার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগ এনেছিলেন সরকার। উক্ত কবিতায় তিনি কাউকে ছেড়ে কথা কন নি, গুরুদেবকেও না। গুরুদেব সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন—

রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে আজ দিগন্তরে
সে কর শুধু পশল না মা, বদ্ধ কারার অন্ধকারে
গগন পথে রবি-রথের শত সারথি হাঁকায় ঘোড়া
মর্ত্তে দানব মানব পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোঁড়া।

প্রেসিডেন্সি জেল হতে নজরুলকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল হুগলী জেলে। সেখানে রাজবন্দীদের উপরে কারা-কর্তৃপক্ষ নানারূপ অত্যাচার করতেন, খাবাব দিতেন নিম্নশ্রেণীর। এর প্রতিবাদে নজরুল অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বরেণ্য নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করার পর এবং সরকার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় উনচল্লিশ দিন পরে নজরুল তাঁর অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছিলেন। অনেক বিখ্যাত নেতারা এবং আত্মীয়-বন্ধুর অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত দেশবন্ধু এবং কবিগুরুর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে 'তার' করেছিলেন—Give up hunger strike, our literature claims you। এ তারবার্তা অবশ্য সরকার নজরুলকে পেতে দেন নি কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

হুগলী জেলে থাকাকালে নজরুল করিগুরুর 'তোমরি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে' গানটির প্যারডি করে গাইতেন—

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে
তুমি ধন্য ধন্য হে—
আমারি এ গান তোমারি ধ্যান
তুমি ধন্য ধন্য হে।
রেখেছ শাস্ত্রী পাহারা দুয়ারে—
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছ শিকল প্রণয়ের ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে।...

'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে' প্রভৃতি

গুরুদেবের গানগুলি তিনি হুগলী জেলে গাইতেন, গাইতেন দরাজ-কণ্ঠে। ঐ সময়ে—'কারার ঐ লৌহ কপাট' প্রভৃতি উদ্দীপনাময় অনেকগুলি গান তিনি হুগলী জেলে থাকাকালে রচনা করেছিলেন।

কারা গৃহের অন্ধকার "জেলে" নজরুল যেমন তাঁর গুরুদেবকে বিস্মৃত হন নি, তেমনি গুরুদেবও ভুলতে পারেন নি তাঁর এই প্রিয় শিষ্যটিকে। ১৩২৯ সালের ১০ই ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' নাটক প্রকাশিত হলে দেখা গেল—তিনি তাঁর ঐ বইখানি উৎসর্গ করেছেন নজরুলকে।

জেল থেকে খালাস হবার কয়েক বৎসর পরে নজরুলের কবিতা-সংকলন গ্রন্থ 'সঞ্চিতা' প্রকাশিত হয়। নজরুল তাঁর এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছিলেন গুরুদেবকে। উৎসর্গ-পত্রে লিখেছিলেন—

বিশ্বকবি সম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু—

এই কয়টি কথার মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কি রকম ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন, তার একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

নাসিরুদ্দীন সাহেবের "সওগাত" পত্রিকার তখন খুব নাম-ডাক। প্রচার-সংখ্যাও ছিল তার উল্লেখযোগ্য। সেকালের "প্রবাসী"র কাছাকাছি। নজরুল ছিলেন তখন "সওগাতের" প্রধান লেখক। সওগাত-গোষ্ঠীর কোন এক নজরুল-ভক্ত একদিন কথায় কথায় কবিগুরুর সঙ্গে নজরুলের তুলনা করেন। তাঁর কথা শেষ হতে না হতে নজরুল রাগে গর্জন করে উঠলেন এবং অতঃপর উক্ত-বিধ উক্তি করতে নিষেধ করেন। কবিগুরু সম্পর্কে কোনরূপ অশ্রদ্ধা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

কবি নজরুল ইসলামের পরিচালনাধীনে "নওরোজ" নামে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা বের হয়েছিল। উক্ত পত্রিকায় প্রধান

লেখকরূপে নজরুল পেতে চেয়েছিলেন গুরুদেবকে, এবং পেয়েছিলেনও। নানা কারণে পত্রিকাটি কয়েক মাসের বেশী চলেনি।

কবিগুরুর অশীতিবর্ষ জন্ম-উৎসব পালন করবার কিছু আগে হতে নজরুলের মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ সামান্য সামান্য প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিলেন। এই অবস্থাতে তিনি গুরুদেবের উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি' নামক একটি সুদীর্ঘ কবিতা। উক্ত কবিতায় তিনি লিখেছেন--

আমি আজি ভুলে গেছি আমি ছিনু কবি,
ফুটেছি কমল হয়ে তব করে রবি।
প্রস্ফুটিত সে কমল তব জন্মদিনে—
সমর্পিনু শ্রীচরণে লহ কৃপা করি।
জানি না জীবনে মোর এই শুভদিন
আবার আসিবে ফিরে কবে কোন্ লোকে—।
আমি জানি মোর আগে রবি নিভিবে না—
তার আগে ঝরে যেন যাই শতদল।

সত্যকার কবিরা নাকি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। তাই আমরা দেখি, কবিগুরুর পরবর্তী শুভজন্ম-বার্ষিকী উৎসবে সর্বাঙ্গীন সুস্থ অবস্থায় যোগ দেবার সুযোগ নজরুল আর পান নি। 'আমি জানি মোর আগে রবি নিভিবে না' তাঁর এ কথা প্রকারান্তরে সত্য হয়েছে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের তিরোধান-কালে নজরুলের কবি-চিত্ত পূর্বের মত সজাগ ও সক্রিয় ছিল না। তাঁর দেহ ও মন যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। তাঁর সৃষ্টির গোমুখী ধারার তরঙ্গ-দোলা হয়ে আসছিল ক্রমে ক্রমে স্তব্ধ। কবিগুরুর তিরোধানের দুঃসংবাদের বাত্যা কিছু সময়ের জন্য যেন আবার তাঁর সৃষ্টি-নির্ঝরের বুকে তুলেছিল একটা আলোড়ন। তাঁর লেখনীমুখে বের হয়েছিল ষাট পঙক্তির একটি কবিতা—'রবিহারা'।

কলকাতা রেডিও-যোগে প্রচারিত হয়েছিল সে কবিতা। ঐ সময়ে তিনি লিখেছিলেন গুরুদেব সম্পর্কে একটি সঙ্গীতও। আমরা নিম্নে কবিতাটির অংশ বিশেষ এবং সঙ্গীতটি সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করছি। গুরুদেবের প্রতি শিষ্য-নজরুলের সর্বশেষ না হলেও—তাঁর সক্রিয় জীবনের শেষদিকের অর্ঘ্য হিসাবে তাঁর এ রচনাগুলি আমাদের নিকট অতীব মূল্যবান।

দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে অস্ত-পথের কোলে
শ্রাবণের মেঘ ছুটে এলো দলে দলে—
উদাস গগন তলে

বিশ্বের রবি ভারতের রবি
শ্যাম-বাংলার হৃদয়ের রবি,
তুমি চলে যাবে বলে

তব ধরিত্রী-মাতার রোদন তুমি শুনেছিলে নাকি
তাই কি রোগের ছলনা করিয়া মেলিলে না আর আঁখি।
আজ বাংলার নাড়ীতে নাড়ীতে বেদনা উঠিছে জাগি,
কাঁদিছে সাগর, নদী, অরণ্য, হে কবি তোমার লাগি।
তব রসায়িত রসনায় ছিল নিত্য যে বেদবতী।
তোমার লেখনী ধরিয়া ছিলেন যে মহা সরস্বতী,
তোমার ধ্যানের আসনে ছিলেন যে শিবসুন্দর
তোমার হৃদয়-কুঞ্জে খেলিত যে মদন-মনোহর
যেই আনন্দময়ী তব সাথে নিত্য কহিত কথা—
তাহাদের কেহ বুঝিল না এই বঞ্চিতদের ব্যথা।
কেমন করিয়া দিয়ে কেড়ে নিলে তাঁদের কৃপার দান
তুমি যে ছিলে এ বাংলার আশা-প্রদীপ অনির্বাণ।
তোমার গরবে গরব করেছি, ধরারে ভেবেছি সরা,
ভুলিয়া গিয়াছি ক্লৈব্য-দীনতা-উপবাস-ক্ষুধা-জরা।

মাথার উপরে নিত্য জ্বলিতে তুমি সূর্যের মত
তোমারি গরবে ভাবিতে পারি নি, আমরা ভাগ্যহত।

ভারত-ভাগ্য জ্বলিছে শ্মশানে, তব দেহ নয়, হায়
আজ বাংলার লক্ষ্মী-শ্রীর সিঁদুর মুছিয়া যায়।
আজ প্রাচ্যের কাব্য-ছন্দ, সুরের সরস্বতী
তোমার শ্মশান শিখায় দগ্ধ করিল চাঁদের জ্যোতি।
ভূভারত জুড়ে হিংসা করেছে এই বাংলার তরে
আকাশেব ববি কেমনে আসিল বা লার কুঁড়ে ঘরে!
এত বড়, এত মহৎ—বিশ্ব-বিজয়ী মহামানব
বাংলার দীনহীন আঙিনায় এত পরমোৎসব—
স্বপ্নেও আর পাইব কি মোরা? তাই আজি অসহায়
বাংলার নর-নারী, কবিগুরু সান্ত্বনা নাহি পায়।
আমরা তোমারে ভেবেছি শ্রীভগবানের আশীর্বাদ,
সে আশিস্ যেন লয় নাহি করে মৃত্যুর অবসাদ।
বিদায়ের বেলা চুম্বন লয়ে যাও তব শ্রীচরণে,
যে লোকেই থাক হতভাগ্য এ জাতিরে রাখিও মনে!

১৩৪৮ সনের ভাদ্র সংখ্যা "সওগাতে" উক্ত কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্ধৃত কবিতার মধ্যে কবিগুরুর প্রতি কবি নজরুলের অন্তরের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা স্বতঃ উৎসারিত হয়ে ফুটে উঠেছে, আর, সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে—তাঁর দেশ ও জাতির প্রতি প্রীতি ও প্রেম। গুরুদেবের কাছে তাঁর বিদায় ক্ষণেও বিনত শিষ্যের কাতর প্রার্থনা: 'যে লোকেই থাক, হতভাগ্য এ জাতিরে রাখিও মনে'। চারণ কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আজও আমরা কবিগুরুর কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রস্থান উপলক্ষে রচিত নজরুলের শোকগীতি—

ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে জাগায়োনা, জাগায়োনা,
সারা জীবন যে আলো দিল ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙায়োনা,
(যে) সহস্র করে স্বপ্ন-রস দিয়া
জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া
তাঁহারে শ্রান্তি চন্দন দাও, ক্রন্দনে রাঙায়োনা—
যে তেজ, শৌর্য, শক্তি দিলেন আপনারে করি ক্ষয়
তাই হাত পেতে নাও,
বিদেহ রবি ও ইন্দ্র মোদের নিত্য দেবেন জয়
কবিরে ঘুমাতে দাও।
অন্তরে হের হারানো রবির জ্যোতি
সেইখানে কর নিত্য তাঁরে প্রণতি
আর কেঁদে তারে কাঁদায়োনা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরমভক্ত শিষ্য বিদ্রোহী ও চারণ-কবি নজরুল ইসলাম সম্বিতহারা না হলে, তাঁর কাছ থেকে গুরুদেব সম্পর্কে আজ অনেক নূতন কথা, নূতন কবিতা ও গান শুনতে পেতাম আমরা; তাঁকে পেতাম রবীন্দ্র-শততম-জন্ম-উৎসবের পুরোভাগে। কিন্তু সে সুযোগ আমরা পেলাম না। এজন্য আমাদের মনে একটা দুঃখ রয়ে গেল।

'রবির জন্মতিথি' শীর্ষক কবিতাটি, বোধহয় কবি নজরুল ইসলামের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রচিত সর্বশেষ রচনা। কবিগুরুর একাশীবর্ষ জন্ম-উৎসব উপলক্ষে নজরুল ইসলাম উক্ত কবিতাটি লিখেছিলেন বলে জানা যায়। বলা বাহুল্য যে নজরুলের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তখন অনেকখানি অসুস্থ। আমরা উক্ত কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি—

রবির জন্মতিথি কয়জন জানে?
অঙ্ক কষিয়া পেয়েছে কি বিজ্ঞানে?

ধ্যানী যোগী দেখেছে কি? জ্ঞানী দেখিয়াছে!
ঠিকুজি আছে কি কোন জ্যোতিষীর কাছে?
নাই—নাই—! কত কোটী যুগ মহাব্যোমে—
আলো অমৃত দিয়ে ধ্রুব রবি ভ্রমে।
রবি কি অস্ত যায়? অন্ধ মানব
রবি ডুবে গে'ল ব'লে করে কলরব।
রবি শাশ্বত, তাঁর নিত্য প্রকাশ—
রূপ ধরি পৃথিবীতে ক্ষণিক বিলাস
করিয়া চলিয়া যায় জ্যোতির্লোকে
এখনো দ্রষ্টা নেহারে তাঁর চোখে।
এই সুরভিত ফুল, রসভরা ফল
রবির গলিত প্রেম-বৃষ্টির জল
কবিতা ও গান সুর নদী হয়ে বয়।
রবি যদি মরে যায় পৃথিবী কি রয়?
নিরক্ষর ও নিস্তেজ বাংলায়
অক্ষর-জ্ঞান যদি সকলেই পায়,
অক্ষয় অব্যয় রবি সেই দিন
সহস্র করে বাজাবেন তাঁর বীণ।
সেদিন নিত্য রবির জন্মতিথি
হইবে, মানুষ দিবে তাঁরে প্রেম-প্রীতি।

রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে, চিনতে হলে এবং বুঝতে হলে যে শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষা হতে আমাদের দেশের বিপুল জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ এখনও বঞ্চিত। নজরুল সেই সত্য কথাই প্রকাশ করেছেন, প্রতিধ্বনি করেছেন কবিগুরুর 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা' উপদেশ-বাণীর। কবিগুরুর ও কবি-শিষ্যের উল্লিখিত বাণী এবং উপদেশ যদি আমরা জন-জীবনে রূপায়িত করে তুলতে পারি, তবেই সার্থক হবে আমাদের রবীন্দ্র-ভক্তি।

আমাদের কাজীদা

আব্বাসউদ্দীন আহমদ

কাজী নজরুল ইসলামকে প্রথম দেখি আমি যখন কুচবিহার কলেজে বি. এ. ক্লাশের ছাত্র। স্কুল ও কলেজের মিলিত বার্ষিক মিলাদ উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি কুচবিহারে আসেন। স্টেশনে গিয়েছি তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনার জন্য। ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা হতে তিনি নামলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই কী বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন! মাথায় বিরাট কালোকৃষ্ণ বাবরী চুল, বিশালায়ত আঁখি আর মোমলাগানো একজোড়া গোঁফ। শোভাযাত্রা করে তাঁকে কলেজ হোস্টেলে নিয়ে আসা হল। সৌভাগ্যবশতঃ আমার প্রকোষ্ঠেই তাঁর শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুপুরে মিলাদ অনুষ্ঠান বেশ হল। নতুন মসজিদ-প্রাঙ্গণে বিকাল চারটা থেকে কবির বক্তৃতা। তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন আর চার-পাঁচ মিনিট পরে পরেই বলেছেন—"আপনারা এই মিলাদ উপলক্ষে বক্তৃতা শুনবার জন্য আমার কাছ থেকে যা আশা করেছেন সে আশা পূর্ণ করতে পারব না। আমি বক্তা নই, বক্তৃতা দিতে উঠলে আমি কথার খেই হারিয়ে ফেলি। আমার যা বক্তব্য আমি গানে গানে বলতে চেষ্টা করি।"

আসরের নামাজের জন্য পনের মিনিট সভার কাজ বন্ধ রইল। নামাজ শেষে পুনরায় সভার কাজ শুরু হল। কবি বলে উঠলেন, "আপনারা আমাকে মিলাদের সভায় ডেকে এনে ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনবেন আশা করেছিলেন, কিন্তু আমি ধর্ম বিষয়ে কি বলব? যৌবনই আমার ধর্ম, যৌবনের কর্মচাঞ্চল্যের প্রতিটি মুহূর্তেই আমার

এপার ওপারের পাথেয়। আমার কথা হল, বর্তমানে বড় ধর্ম—দেশের কাজ। পরাধীনতার গ্লানি আর আপনারা কত কাল বয়ে চলবেন? আপনারা লক্ষ্য করেছেন, আসরের নামাজ আমি পড়লাম না। পরাধীন দেশে কী করে নামাজ পড়ি? আমার দেশ স্বাধীন না হলে আজ নামাজ পড়তে বসে যদি ইংরেজ আমার জায়নামাজ কেড়ে নেয়…?"

একথা শোনামাত্রই সভায় উঠল অস্ফুট গুঞ্জন। সে গুঞ্জন ক্রমশঃ কলহে পরিণত হতে চলল। আমরা ছাত্ররা বেগতিক দেখে তাঁকে নিয়ে হোস্টেলে সরে পড়লাম। সন্ধ্যার পর বৈরাগীদীঘির ধারে কুচবিহার ক্লাব প্রাঙ্গণে তাঁর গানের আসর বসল। শহরের আবাল-বৃদ্ধবণিতা সে আসরে ভিড় জমিয়েছে। সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা অবধি সেখানে তিনি একা গেয়ে চলেছেন তাঁর শিকল পরার গান, চরকার গান, জাতের নামে বজ্জাতি ইত্যাদি। গানে আবৃত্তিতে সবার প্রাণে এনে দিলেন যৌবন-জোয়ার।

কুচবিহার করদ-মিত্র রাজ্য। ইরেজের বিরুদ্ধে এত কথা এত গান বড় বড় কর্তাদের কানে গেল। পুলিশের কর্মচারীরা সাদা পোশাকে হোস্টেলের আশেপাশে আনাগোনা শুরু করল। কাজীসাহেব নির্বিকার। তাঁকে নিয়ে এ-বাসা সে-বাসা চলল ঘরোয়া জলসা। আমি তখন কলেজ ম্যাগাজিনে গল্প লিখি। আর্য সাহিত্যসমাজ থেকে আমি 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি পেয়েছি। নামের শেষে সেই উপাধিটা দেখে কাজীসাহেব বলে উঠলেন, "এত অল্প বয়সে এত বড় লেজ লাগিয়েছ কেন?" লজ্জায় মরে গেলাম। জীবনে অতঃপর আর এ উপাধিটা কোথাও ব্যবহার করিনি। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কেউ হয়তো গোপনে আমার শত্রুতা সাধন করেছিল, কারণ কাজিসাহেব বলে উঠলেন, "তোমার লেখা গল্প তো পড়লাম, এবার একখানা গান শোনাও দেখি?" আমি এবার সত্যি লজ্জায় যেন মিইয়ে গেলাম। শিল্পীদের প্রথম জীবনে এটা হয়ই। কেউ যদি বলে, 'এ বেশ গায়', অমনি বলা

হয় 'যা মিথ্যুক কোথাকার।' কিছুতেই সঙ্কোচ কাটিয়ে হারমোনিয়ামের পাশে যেতে পারছি না। কাজীসাহেব বলে উঠলেন, "তুমি ভয় পেয়ো না, আমি কোনও ভুল ধরব না ; নিশ্চিন্তে গেয়ে যাও।" রবীন্দ্র-সঙ্গীত ধরলাম—'সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে।' কাজী-সাহেব মহা উৎসাহে আমার পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, "অদ্ভুত মিষ্টি কণ্ঠ! দেখ, তোমার নিজের চেহারা যেমন আয়না ছাড়া তুমি নিজে দেখতে পাও না, তেমনি তোমার গলার সুরও যে কত মিষ্টি তুমি নিজে তা বুঝতে পারবে না, যদি না রেকর্ডের মাধ্যমে শোনো। তুমি কলকাতা চল, রেকর্ড করাব তোমার।"

এর দু'বছর পরে কলকাতা গিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীতে কাজী-সাহেবকে দেখে থমকে গিয়েছিলাম। সে গোঁফ আর নেই, সে বলিষ্ঠ দেহ আর নেই। শরীরটা হয়েছে থলথলে, নাদুসনুদুস, তবে মাথার চুলগুলো আর সেই আয়ত আঁখির মদিরা ঠিকই আছে। দেখে একটু গম্ভীর প্রকৃতির মনে হল তাঁকে।

কিন্তু এ গাম্ভীর্য যে তাঁর কপট গাম্ভীর্য তা টের পেলাম দু'দিনেই। কোথায় গাম্ভীর্য? এই লোক গম্ভীর হয়ে কি পাঁচমিনিটও থাকতে পারে? গম্ভীর, চায়ে দু'তিন চুমুক দিয়ে একটা পান মুখে দিলেই মুখ থেকে খই ফুটতে আরম্ভ করল। তারপর তিনি গল্প আরম্ভ করলে সে আসরে আর গল্প জমায় কার সাধ্যি? শুধু কি গল্প? হাসি? এমন দিলখোলা উচ্চহাসি যে না শুনেছে সে কল্পনাও করতে পারবে না হাসি কি জিনিস। গ্রামোফোনের রিহার্সাল কক্ষে বলুন, তাঁর বাড়ীতেই বলুন, রেডিও অফিসে বলুন, দোতলা তেতলা বাড়ীগুলো যেন ফেটে পড়তে চাইত তাঁর হাসির শব্দে। সে হাসিতে সমতালে যোগ দিতে পারতেন আর দু'টি মাত্র লোক, তাঁরা হচ্ছেন হাসির গান গাইয়ে হরিদাসবাবু আর রঞ্জিত রায়। আমরাও হাসতাম, কিন্তু অত জোরে এবং অতক্ষণ ধরে নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঐ ধরনের হাসি হাসলে আমাদের ফুসফুস ছিঁড়ে হেঁচড়ে বেরিয়ে আসত হয়ত!

গ্রামোফোন কোম্পানীর জন্য অজস্র গান লিখেছেন তিনি। গানের খাতাগুলো সাধারণতঃ কোম্পানীর রিহার্সাল-রুমেই রেখে যেতেন। কোন এক কবি তখন গ্রামোফোন কোম্পানীতে নতুন গান দেওয়া শুরু করেছেন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ দু'একজন শিল্পীর কণ্ঠে তাঁর রচিত গান গীত হয়ে রচয়িতা হিসাবে পরিচিত হচ্ছেন। এহেন কবি কাজীদার সেই সব গানের খাতা থেকে কবিতার বিষয়বস্তুই নয়, লাইনকে লাইন হুবহু নকল করে তাঁর নিজের গানের ফাঁকে ফাঁকে চালাতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্ত একদিন কাজীদাকে বললেন, ' কাজীদা, আপনি এভাবে গানের খাতাগুলো এখানে রেখে বাড়ীতে যান, কিন্তু এমন কবিও এখানে উদয় হয়েছেন যাঁরা আপনার এইসব খাতা থেকে কবিতার শুধু ভাবই নয়, লাইনকে লাইন তাদের রচনার ভেতর চালিয়ে যাচ্ছে।"

কাজীদা একথা শুনে প্রথমতঃ একটু গম্ভীর হলেন, তারপর তাঁর স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বলে উঠলেন, "আরে পাগল, মহাসমুদ্র থেকে ক'কলসী আর নেবে?"

হিংসা বলে কোন পদার্থ তাঁর মনে ছিল না। গোলাম মোস্তাফার সাথে কাজীদার ইডিয়লজিতে খুব তফাৎ। এই গোলাম মোস্তাফা "বিদ্রোহী" কবিতার সমালোচনা করে কবিতা লিখেছিলেন। অথচ রিহার্সাল-রুমে যতদিনই কাজীদার সাথে দেখা হয়েছে তিনি আগেই দু'হাত বাড়িয়ে গোলাম মোস্তাফাকে আলিঙ্গন করেছেন। বস্তুতঃ ব্যক্তিগত জীবনে দু'জনের মধ্যে কোনদিন কোন মনোমালিন্য দেখিনি।

কাজীদার কাছে আমরা এই শিক্ষা লাভ করেছি। গিরীন চক্রবর্তী একদিন স্পষ্টই আমাকে বলেছিল, "তোমার উপর আমার হিংসা হয়। দার্জিলিংয়ে প্রথম আমাদের বন্ধুত্ব। প্রায় একই সময়ে আমরা রেকর্ড জগতে প্রবেশ করি, কিন্তু তোমার কেনই বা এত নাম আর আমার কেন হল না।" উত্তর দিয়েছিলাম, "কিন্তু ভাই আমার চাইতে তো কেষ্টবাবুর বেশী নাম, কই আমার তো কোনদিন সেজন্য

হিংসা হয় না।" এই সঙ্গীত-জগতে বেশীদিন হয়ত আমি টিঁকে থাকতে পারতাম না, যদি না কাজীদার একদিনের একটা কথায় আমার চমক ভাঙত। রিহার্সাল-রুমের দোতলায় বসে আমি একদিন কৃষ্ণচন্দ্র দে'র একখানি কীর্তন গাইছিলাম—'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু ওইখানে থাকো', কাজীদা কতক্ষণ হল দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন খেয়াল করিনি। আমি কিন্তু কেষ্টবাবুর 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সঙ্গতী ভেসে আসে', 'ফিরে চল আপন ঘরে', 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে' এই গানগুলো খুব গাইতাম, আর গাইতাম অবিকল কেষ্টবাবুর গলার স্বর নকল করে।

কাজীদাকে হঠাৎ দেখে গান থামিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। মৃণাল, ধীরেন দাস এরা কাজীদাকে দেখে হেসে বললেন, "দেখুন কাজীদা, আব্বাস কি চমৎকার কৃষ্ণবাবুর নকল করেছে।" কাজীদারও খুব খুশী হবার কথা, কিন্তু তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, "আব্বাস, চোখ তোমার অন্ধ হয়নি বরং চশমা পর্যন্ত এখনও নাও নি। কাজেই সেদিক দিয়ে তুমি কানাকেষ্ট নও। তারপর ওঁর গলা নকল করে গান গাইলে জীবন ভরে তোমাকে এই অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়াতে হবে যে, 'আব্বাস! ওঃ, সে তো কেষ্টবাবুর নকল!' কাজেই কেষ্টবাবু কেষ্টবাবুই, ধীরেন দাস ধীরেন দাসই, মৃণাল মৃণালই আর আব্বাস আব্বাসই থাকবে! কখনো নিজের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, যাকে বলে অরিজিন্যালিটি নষ্ট করবে না।"

সেদিন থেকে অন্যের কণ্ঠ নকল করে গাওয়ার অভ্যাস চিরদিনের মত ছেড়ে দিয়েছি।

একদিন কাজীদার বাসায় বসে আছি এমন সময় এক চীনাম্যান হকার পাশ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে, 'সিল্কের কাপড়—চাই—'। কাজীদার ইঙ্গিতে তাকে ভেতরে নিয়ে আসা হল। এ-কাপড় সে-কাপড় দেখে তাঁর পুত্রের জন্য কয়েক গজ সিল্ক কেনা হল। দাম যা চাইল তাই-ই দিয়ে দিলেন।

এর চার-পাঁচ দিন পরে আবার সেই চীনাম্যান হেঁকে যাচ্ছে কাজীদার বাসার পাশ দিয়ে। আজও তাকে ডাকা হল। চীনাম্যান কাজীদার কথামত সেদিনও সেই ধরনের কয়েক গজ সিল্কের কাপড় মেপে কেটে দিল। লক্ষ্য করলাম আজ দামটা যেন দেড়গুণ বেশী। অম্লান বদনে সেই টাকাটাই তিনি দিয়ে ফেললেন। আমি বললাম, "কাজীদা এই চার-পাঁচ দিন আগে খোকাদের জন্য এই কাপড়ই কিনলেন, সেদিন তো এর দাম দিয়েছিলেন—"। তিনি হেসে বললেন, "আরে দুটো পয়সা লাভের জন্যেই তো বেচারী অতবড় একটা কাপড়ের পাহাড় মাথায় করে বেড়ায়?"

মেগাফোন কোম্পানিতে আমি একদিন একটা ভাওয়াইয়া গানের কলি আওড়াচ্ছিলাম। কাজীদা কতক্ষণ ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন টের পাইনি। গান শেষ হয়ে গেলেই তিনি ঘরে ঢুকে বললেন, "গাও তো আব্বাস, আবার গাও।" আমি গানটা গাইলাম। বললেন, "না, তুমি গেয়েই চল যতক্ষণ আমি থামতে না বলি" চোখ বুজে গানটা বোধহয় দশ-পনের মিনিট গেয়েছি, এবার তিনি বললেন, "আচ্ছা, এবার এই গানটা গাও দেখি, ঠিক ঐ সুরে।" ওরই মধ্যে অবিকল সেই সুরে তাঁর গান লেখা হয়েছে। আমার গানের কলি ছিল—

"নদীর নাম সই কচুয়া
মাছ মারে মাছুয়া
মুই নারী দিচোং ছেকাপাড়া"—

কাজীদা লিখেছেন—

"নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি
আমি যাব না আর অঞ্জনাতে
জল নিতে সখি লো
ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকি ॥"

ভাওয়াইয়া গান শুনালেই কবি বড় চঞ্চল হয়ে উঠতেন। বহুদিন বলেছিলেন, "জানি না, এ গানের সুরে কী মায়া; আমার মন চলে যায় কোন্ পাহাড়িয়া দেশের সবুজ মাঠের আঁকাবাঁকা আলোর প্রান্তিকে, উপপ্রান্তিকে।" এর পর তাঁর প্রসিদ্ধ একখানা গানে তিনি আমাকে ভাওয়াইয়া সুরই সংযোগ করতে বলেছিলেন! সে গান হচ্ছেঃ "কুঁচবরণ কন্যা রে তার মেঘবরণ কেশ।"

গ্রামোফোন কোম্পানিতে একদিন সবাই বসে বেশ গুলতানী গল্প করছিলাম। এমন সময় কাজীদার প্রবেশ। তিনি বললেন, "দেখ হঠাৎ যদি আজ লটারীতে তোমরা এক লক্ষ টাকা পাও তাহলে তোমাদের বৌ বল প্রিয়া বল তাকে কী কী জিনিস দিয়ে সাজাবে তোমরা?" এক একজন এক এক রকম বললে। কেউ বা ট্যাক্সি করে এম, বি, সরকারের দোকানে গিয়ে হীরে জহরতের জড়োয়া সেট কিনবে বললে, কেউ বা ওয়াসেল মোল্লার শাড়ির যত রকম ডিজাইন আছে সব কিনবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজীদা হারমোনিয়ামটা টেনে বলে উঠলেন, "শোন, আমি কি দিয়ে প্রিয়াকে সাজাতে চাই।" বলেই গান ধরলেন—

মোর প্রিয়া হবে এস রানী দেবো খোঁপায় তারার ফুল
কর্ণে দোলাব দ্বিতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল।
কণ্ঠে তোমার পরাব বালিকা
হংস-শাড়ীর দোলানো মালিকা
বিজলি জরির ফিতায় বাঁধিয়া মেঘ রং এলো চুল॥
জোছনার সাথে চন্দন দিয়ে মাখাব তোমার গায়
রামধনু হতে লাল রং ছানি আলতা পরাব পায়
আমার গানের সাত সুর দিয়া
তোমার বাসর রচিব প্রিয়া
তোমারে ঘিরিয়া গাহিব আমার কবিতার বুলবুল॥

গান শেষ হলে বললেন, "কী মহারথীর দল, ক'টাকা লাগল প্রিয়াকে সাজাতে ?"

কাজীদার খাতায় একখানা গান দেখে বড় লোভ হল গানটা নেবার জন্য। বললাম "কাজীদা, এ গানটা আমি রেকর্ড করতে চাই।" তিনি বললেন, "স্বচ্ছন্দে"। তখুনি গানটা আমাকে শিখিয়ে দিলেন। এর দু'দিন পরেই বিশেষ কোন কাজ উপলক্ষে আমাকে দেশে যেতে হয়—সেখানে আটকা পড়ে থাকি প্রায় দু'মাস। ফিরে এসে কাজীদাকে বললাম, "দাদা, ওখানা গানের সুরে তো তোলা হয়ে গেছে—রেকর্ডের অপর পৃষ্ঠার গানটা আজ শিখিয়ে দিন।" তিনি বললেন, "ওহো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, গানটা জোর করে পদ্মরাণী চ্যাটার্জী নিয়ে রেকর্ড করে ফেলেছে।" কী আর বলব, দুঃখে চোখে পানি এল। বাজারে যখন সে রেকর্ড বের হল আমি গানের সুর শুনে কাজীদাকে বললাম, "কাজীদা এ গান যে জবাই করা হয়েছে।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি তোমাকে যে সুর শিখিয়েছি মেয়েটা কিছুতেই সে সুর আয়ত্ত করতে পারলে না, কাজেই সহজ সুরই দিতে হল। জানি এ গানের এ সুর গানের বাণীকে রূপায়িত করতে পারেনি।" সে গান হচ্ছে 'যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায় তুমি করিবে প্রণাম'।

ইসলামী গানের যখন ভীষণ চাহিদা তখন কাজীদার বাসায় গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম। প্রথমে বাসায় যেতেই তাঁর এক চাকর 'হইরা' বা 'হরি' বলে উঠত, "নাই, কাজীসাহেব বাসায় নাই।" প্রথম প্রথম ঐ কথা শুনে ফিরে আসতাম। একদিন যেই 'হইরা' বলে উঠল—"নাই, কাজীসাহেব বাসায় নাই" অমনি অন্যঘর থেকে ভেসে এল কাজীদার হাসির শব্দ। এরপরও গতানুগতিকভাবে একই উত্তর পেতাম হইরার কাছে; কিন্তু ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বসলেই ঠিক দেখা পেতাম কাজীদার। পরে এক গূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেছি। কাজীদাকে পাওনাদার প্রায়ই বিরক্ত করত। তাই চাকরের উপর এ

নির্দেশই ছিল। কিন্তু সেই হাবাকান্ত এটাও বুঝতে পারেনি যে পাওনাদারের পর্যায়ে আমি নই। অবশ্যি আমার উপস্থিতিটা এক-জনের খুব মনঃপূত হতো না এবং একথা আজ লিপিবদ্ধ করতে মনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছি না, তবু সত্যের খাতিরে লিখে যাচ্ছি। কাজীদার শাশুড়ী আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। কারণ ইসলামী গান কাজীদা লিখুন এটা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কী করে তা বুঝলাম সেই কথাটাই বলছি। একদিন আমি যে বাইরের ঘরে বসে আছি সেটা তিনি হয়ত ভিতর থেকে জানতেন না। সকালবেলা, কাজীদা আমার ইসলামী রেকর্ডের একখানা নেগেটিভ কপি বাজাচ্ছিলেন। তাঁর শাশুড়ী বাইরের ঘরের পাশ থেকেই বলে উঠলেন, "সকালবেলা নূর আর গান পেল না—কী সব গান বাজানো শুরু করে দিল!" আমাকে দেখলে হয়ত কাজীদাও লজ্জা পাবেন, তাই চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

কাজীদার লেখা ইসলামী গানগুলোর শতকরা ৯৫ ভাগই তাঁর নিজস্ব সুর সংযোগ করা। মাত্র অল্প ক'টি গান তিনি দিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্ত আর চিত্ত রায়কে সুর করে আমাকে শিখিয়ে দেবার জন্য। ইসলামী গানে তিনি যে কী অপূর্ব সুরই সংযোগ করেছিলেন যাঁরা সুরজ্ঞ বা গানের সমঝদার তাঁরা একথা স্বীকার করবেনই।

স্বদেশী যুগে ধীরেন দাসের কণ্ঠে 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও' ইত্যাদি গান বিশেষ আদৃত হচ্ছে তখন। কাজীদা বললেন, "আব্বাস, দু'খানা স্বদেশী গান গাইবে?" রাজী হলাম তখনি। তিনি দু'খানা গান শিখিয়ে দিলেন। একখানা হচ্ছে 'ভোলো লাজ ভোলো গ্লানি জননী মুক্ত আলোকে জাগো', আর একখানা 'নম নম নম বাংলা দেশ মম চির মনোরম চির মধুর'। গান দু'খানার বাণী কি অপরূপ।

মৃণালকান্তি ঘোষ আর আমি দু'জনে মিলে কাজীদার দু'খানা গান রেকর্ড করি। ঢাকায় যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে কাজীদা তখনি

এ গান লিখে দিয়েছিলেন—'ভারতের দুই নয়নতারা হিন্দু মুসলমান', আর একখানা 'হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই'।

একবার দার্জিলিংয়ে কাজীদার সাথে দেখা। তিনি বললেন, "আব্বাস, রবীন্দ্রনাথ (তিনি বলতেন গুরুদেব) এসেছেন এখানে, চল দেখা করতে যাই।" আমি বললাম, "চলুন।" একদল যুবক চলেছি। মাল-এর কাছে এসে আমি চট করে অন্য পথ ধরে একদম হাওয়া হয়ে গেলাম। পরদিন কাজীদা আমাকে খুব গালাগালি করে বললেন, "দেখ আমি গুরুদেবকে প্রণাম করেই বলে উঠেছি—গুরুদেব আজ একটি ছেলের অপূর্ব কণ্ঠ শোনাব আপনাকে, তারপর হাতড়ে দেখি তুমি একদম নেই। কি আশ্চর্য!"

কলকাতায় আরো দু'বার আমাকে কাজীদা কবিগুরুর কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যাইনি কেন তাই বলছি।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে তখন আমি রেকর্ডিং এক্সপার্টের কাজ করি। বাড়ী যাব বলে ক'দিনের ছুটি নিয়েছি। সেই রাতেই দার্জিলিং মেলে রওনা হব। অফিসে এসে দেখি সবাই উন্মনা। কি হবে, কি হবে, রবিঠাকুর বুঝি আজ · !! কিছুক্ষণের মধ্যেই সাড়া পড়ে গেল, রবি-রশ্মি চিরতরে নির্বাপিত। অফিসের সব লোক ছুটছে ঠাকুরবাড়ীর দিকে। গিয়ে দেখি জনসমুদ্র। কার সাধ্য ভিতরে ঢোকে? তিন-চার ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আবার ফিরে এলাম অফিসের দিকে। অফিস একদম জনমানবশূন্য। কে একজন বললে, "তোমাকে টেলিফোনে ডাকছে।" ধরলাম ফোনটা। কলকাতা রেডিওর ষ্টেশন ডিরেক্টর নৃপেন মজুমদার বলছেন, "আব্বাস, একবার রেডিও অফিসে এসো। সবাই রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে গান দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন, তুমিও এসো।" আমি কেমন যেন তখন উন্মনা। আমার ভিতর কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। রবীন্দ্রনাথ আমার অন্তর জুড়ে বসেছিলেন, তিনি নেই এ কথাটা যেন ভাবতেই পারছি না। লালদীঘির ঘাটে কতক্ষণ বসেছিলাম মনে

নেই। প্রায় ছ'টার সময় রেডিও অফিসের দিকে এগিয়ে গেলাম। এক একজন শিল্পী গাইছেন আর গানের শেষে চোখ মুছতে মুছতে ষ্টুডিও থেকে বেরিয়ে আসছেন। আমাকে গাইতে বলা হল। গাইলাম 'ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে, বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে আঁচলখানি দোলে।' প্রায় দশ মিনিট ধরে গাইলাম। জানিনা প্রকৃতির এই শান্ত সমাহিত ভাবাবেশ কেন সেই মুহূর্তে অশান্ত হয়ে উঠেছিল। ওদিকে যখন রবীন্দ্রনাথকে চিতায় তোলা হয়েছে, এদিকে তখন চলেছে আমার বরষার গান, আর ঠিক সেই মুহূর্তটিতে আকাশও অশ্রুসম্বরণ করতে পারেনি। এসেছিল এক ঝাঁক বৃষ্টি অশ্রুধারারূপে। নৃপেনদা সমস্ত আর্টিষ্টকে জানিয়েছিলেন এই স্বতঃস্ফূর্ত আত্ম-নিবেদনের জন্য ধন্যবাদ। আমাকে বলেছিলেন, "আব্বাস, তুমিই কিন্তু হার মানিয়েছ সবাইকে। ধরেছ বর্ষার গান। মেঘশূন্য আকাশ। বৃষ্টি হল ঠিক সেই সময়টাতে যখন চলছে তোমার গান আর গুরুদেবের দেহ ঠিক চিতার উপরে জ্বলছে।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে কাজীদা বড় ভালো গান লিখলেন একখানা। গাইল সেখানা যূথিকা রায়। কাজীদা দুঃখ করে বললেন, "আব্বাস, কতদিন তোমাকে বলেছিলাম গুরুদেবের কাছে চল, গেলে না, জীবনে এ আফসোস আর যাবে না।" আমি বললাম, "কাজীদা, একটা গল্প শুনবেন? আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে ময়মনসিংহ গিয়েছিলাম মহাত্মা গান্ধীকে দেখবার জন্য। তিনদিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি। পচা এক হোটেলে খাই আর সারারাত মশার জ্বালায় ছটফট করি। তিনদিনের পর বৃষ্টি থামল, মহারাজ শশীকান্ত আচার্যের বাগান-বাড়িতে মহাত্মা বিকাল চারটায় দর্শন দেবেন। বেলা দুটোয় গিয়ে মঞ্চের কাছাকাছি আসন নিলাম। মানে দাঁড়িয়ে রইলাম। অতঃপর যেদিকে চাই শুধু লোক আর লোক। ভাবছি এই লোক-পারাবার পার হয়ে বের হব কি করে? যাক, গোটা পাঁচেকের সময় মহাত্মার আবির্ভাব হল। মুণ্ডিত মস্তকই মনে হল। কৌপীন

পরিহিত, আবক্ষ উন্মুক্ত। এই-ই মহাত্মা গান্ধী! ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "চরকা কাটো, খদ্দর পিন্‌হো, বারিষ হো রহি হ্যায়, ঘর যাও"।

ঘরে মানে হোটেলে এলাম। এসে পুঁটলি নিয়ে সোজা ষ্টেশনে এলাম এবং ঘরমুখো টিকিট কেটে চেপে বসলাম।

বিশ্বাস করবেন কাজীদা, সারাটা পথ কি বিরাট আলোড়ন মনের মধ্যে। প্রতিজ্ঞা করতে লাগলাম জীবনে বিরাট ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনীষীকে আর সান্নিধ্যে এসে দেখব না। তাই আমার ধ্যানের কবিগুরুকে ধ্যানের রাজ্যেই রেখেছি। আমার রবীন্দ্রনাথ স্থনীল আকাশের গায়ে রজত-শুভ্র মেঘের সিংহাসনে বসে অবিরাম লিখে চলেছেন, কাশ-পালকের শুভ্র লেখনি দিয়ে মহাকালের শুভ্র খাতায়। দুগ্ধফেননিভ-ঝরনার জলের স্রোতের মত নেমে আসছে সেই কবিতার কলকাকলি নৃত্যের ছন্দে অবিরাম! মর্ত্যের মুগ্ধ শিষ্য আমি; দু'হাত ভরে অঞ্জলি পূরে সেই কবিতার মদিরা পান করে বুঁদ হয়ে আছি। মহাত্মা গান্ধী সন্দর্শনে ধ্যান আমার ভেঙে গিয়েছিল। কল্পলোকের রবীন্দ্রনাথকে তাই আমার কল্পলোকেই রেখেছি।"

কাজীদা বললেন, "বড় চমৎকার, কিন্তু আব্বাস, রবীন্দ্র-দর্শনে তোমার সে ধ্যান ভাঙত না। অমন সুপুরুষ—!" আমি বাধা দিয়ে বললাম, "কাজীদা, রবীন্দ্রনাথের ফটোও তো দেখি, বাস্তবের রবীন্দ্র-নাথের চাইতেও আমার রবীন্দ্রনাথ কত সুন্দর, এ আপনাকে বোঝাই কি করে? জানেন কাজীদা, 'দেবদাস' বই দেখে আমি কি কান্নাটাই কেঁদেছি। আমার কল্পনার পারুল কি এই মর্ত্যবাসিনী যমুনা? না, না কাজীদা—

সে কেন দিল রে দেখা
না দেখা ছিল যে ভাল।

যুদ্ধের বাজারে ভারত সরকার থেকে একটা ডিপার্টমেন্ট খোলা হল—সং পাবলিসিটি অর্গানাইজেশন। কলকাতায় বোমা পড়ার

আতঙ্কে তখন অনেকেই পলায়ন-তৎপর। বাঙালীর এই গুণের সদ্ব্যবহার করতে আমিই বা পশ্চাৎপদ হব কেন? পরের দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী গেলাম। ছুটির পর ছুটি অর্থাৎ দরখাস্ত দিয়ে দিয়ে প্রায় তিন মাস বাড়ীতে কাটিয়ে এলাম ভয়ে ভয়ে। চাকুরী আমার আছে। মিঃ আবু হেনা তখন পাবলিসিটির ডিরেক্টর। তিনি তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বেশ বকুনি দিয়ে বললেন, "যুদ্ধের ভয়ে দেশে গিয়ে লুকিয়ে আছেন আর এদিকে আপনার জন্য একটা চাকরী নিয়ে বসে আছি। এই দেখুন ফাইল। সং পাবলিসিটি অর্গানাইজার, আর একজন অতিরিক্ত অর্গানাইজার নেওয়া হবে। আমি ঠিক করে রেখেছি কাজী নজরুল ইসলাম আর আপনাকে যথাক্রমে পোষ্ট দুটো দেবো। আপনি কাজীকে একবার অফিসে নিয়ে আসুন।"

তখুনি ছুটলাম কাজীদার বাড়ীতে। আমি দেশে যাওয়ার আগে শুনেছিলাম যে 'নবযুগ' অফিসে তিনি হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু এই অসুস্থতার জের যে তিনি তখনো টেনে চলেছেন সেটা ধারণাও করতে পারিনি। আমি জানতাম সাংসারিক অর্থ-কৃচ্ছ্রতার জন্য তিনি খুব মনমরা হয়ে থাকতেন; কিন্তু চির-বিদ্রোহী বীরের কাছে সরকারী চাকরীর কথা কি করে প্রস্তাব করব সেই সমস্যায় দিশেহারা হয়ে তাঁর সামনে বসে ভাবছি। তিনি বেশী কথা বলছেন না, হাতে একখানা রুমাল। লোকজন সামনে এলে ঘন ঘন সেই রুমালে মুখ মোছেন, অন্য সময় নাকি ঘরের দেয়াল, মেঝে থুথু দিয়ে ভরিয়ে ফেলেন। শুনেছিলাম একটু মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। সেটা প্রমাণ পেলাম যখন তাঁকে বললাম, "কাজীদা, 'নবযুগ' আর কত টাকা দেয় আপনাকে, তা ছাড়া খবরের কাগজ তো আজ আছে কাল নেই। আচ্ছা, ধরুন যদি এই পাঁচশো টাকা মাইনের একটা সরকারী চাকরী হয় আপনি করতে রাজী আছেন?" তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠল কি আনন্দোচ্ছাস ভাব, যেন দেখতে পেলেন চোখের সামনে পাঁচশো টাকা। আমার

হাতটা তিনি চেপে ধরলেন, মুখচোরা সেই সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে তিনি সমর্থন জানালেন এ প্রস্তাবকে। কাজীদার বড় ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে। বললাম, "আসছে কাল আমি ঠিক দশটার সময় এসে এঁকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাব, তোমরা কাজীদাকে সাজিয়ে রাখবে।"

পাশের ঘরে এলাম—সানির মা আমাকে বললেন, "আব্বাস, চাকরী ওর হবে ?" আমি তখন কোন্ সুদূরে—হায়, এই কাজীদা, যাঁর হাতে ছিল বিষের বাঁশী, যে বীণাতে আগুন জ্বালিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন অগ্নিবীণা, ইংরেজের পরাধীনতার শিকল ভেঙে যে নির্ভীক সেনানী সারা বাংলার তরুণদের হাইদরী হাঁকে ডেকে গেছেন—দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার পার হয়ে অমৃতের দ্বারে পৌঁছাবার জন্য, যে বীর দেশের মুক্তির জন্য প্রথম পথ-প্রদর্শন করেছেন দীর্ঘ ৪৫ দিন কারাগারে অনশন-ব্রত উদ্‌যাপন করে—পায়ে বেড়ী, হাতের নির্মম শিকলকে যে শিল্পী নূপুরের মত মনে করে গেয়েছেন শিকলপরার গান, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, শহর থেকে উপপ্রান্তিকে যে চারণ গেয়ে ফিরেছেন চরকার গান, সেই কবি কিনা দাসখতে নাম লেখাতে বলায় তিলমাত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন না, একি সত্যি মস্তিষ্ক বিকৃতি নয় ?

ভাবী বলে উঠলেন, "আব্বাস, কাল তো তুমি নিতে আসবে ওঁকে, কিন্তু উনি তো বেশী কথা বলতে পারেন না।" আমার যেন চমক ভেঙে গেল। আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কি বললেন ভাবী ?" ভাবীর চোখে পানি এল। চোখ মুছে বললেন, "জানি ভাই, ওঁকে চাকরী করতে হবে এই কথাটাই ভাবছিলে, কেমন ?" আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "ভাবী, দুনিয়ার মানুষ অবস্থার দাস। কিছুই ভাববেন না। কাজীদার শারীরিক অসুস্থতার মূল্যই তো হচ্ছে সংসারিক অভাব অভিযোগ। দেশের জন্য তিনি এত করেছেন, কিন্তু দেশ যখন এগিয়ে এল না, তখন যেমন করেই হোক টাকা তাঁকে রোজগার

করতেই হবে। তবে ওঁকে এক মুহূর্তও খাটতে দেবো না, সহকারী হব আমি।” একথায় তিনি যেন আশ্বস্ত হলেন। আবার সেই প্রথম কথাই বললেন, “উনি তো বেশী কথা বলেন না। ইণ্টারভিউতে—”

আমি বাধা দিয়ে বললাম, “ইণ্টারভিউ কিছুই নয়। আমার সাথে উনি থাকবেম, যা বলবার আমিই বলব।”

পরদিন ওঁকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে নিয়ে এলাম। হেনা সাহেব কাজীদাকে দেখে চেয়ার থেকে উঠে এসে সসম্মানে তসলিম-করে তাঁকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। কাজীদার মুখে রুমাল কারণ সেই রুমালে ঘন ঘন থুথু ফেলতে হয়, ইশারায় বললেন, “পানি খাব।” তখুনি তাঁকে পানি দেওয়া হল। ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল। পরম আনন্দে চা পান করলেন। হেনা সাহেব ওঁকে বললেন, “কাজীসাহেব, পারবেন তো কাজ করতে?” মাথা দুলিয়ে তিনি বললেন, “হ্যাঁ” আর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, “ও”। হেনা সাহেব হেসে বললেন, “হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আব্বাস সাহেবই আপনাব সহকারী হবেন। ছুটোছুটি এটা-ওটা সবই উনি করবেন, আপনি শুধু আমাদের ফরমাস মত দুটো গান, কবিতা লিখবেন, ব্যাস।”

হয়তো চাকুরীটা হলে তাঁর অভাব ঘুচত, সাময়িক মস্তিষ্কবিকৃতি হয়ত কেটে যেতে পারত, কিন্তু মানুষ ভাবে এক খোদা করেন আরেক! পুলিনবিহারী মল্লিক তখন প্রচার দফতরের মন্ত্রী। জানি না কি করে কাজীদার এই সামান্যতম অসুস্থতার খবরটি তাঁর কর্ণমূলে প্রবেশ করে। তাঁর স্বজনকে এই স্থলাভিষিক্ত করা যায় কি করে এই নিয়ে তাঁর জল্পনাকল্পনা চলল। হেনা সাহেবের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলল। যে চাকুরীতে বিনা দ্বিধায় কাজীদা ও আমাকে বসিয়ে দেবার কথা, সেখানে পোষ্ট দুটোর জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। বলাই বাহুল্য কাজীদাকে ইণ্টারভিউ-বোর্ডের সামনে উপস্থিত করা মানে ঐ কবি-প্রতিভার চূড়ান্ত অপমান।

কাজীদার বাসায় গিয়ে ভাবীকে বললাম মন্ত্রীর চক্রান্তের কথা। তিনি বললেন, "না, চাক্‌রীর জন্যে দরখাস্ত দেওয়া হতেই পারে না। তুমি ঠিকই বলেছ।"

আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা দরখাস্ত করলাম। বাংলার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বহু সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ দরখাস্ত করেছেন—ইণ্টারভিউয়ের দিন দেখলাম। একে একে কুড়ি-পঁচিশজন ইণ্টারভিউ দিলাম। চাক্‌রী আর আমার হবে না জানি তবু ইণ্টারভিউতে ভালো করলাম মনে হল। ফল বের হল। মন্ত্রীর প্রার্থী স্থরেশবাবু প্রথম, জসিম দ্বিতীয়, আর আমি তৃতীয় নমিনেশন পেলাম।

একখানি চিঠি ও তার জবাব

খান মঈনুদ্দীন

১৯২৭ সালের শেষের দিকে একদিন আমরা 'সওগাত' অফিসে মজলিস ক'রে বসে আছি। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং আরো কয়েকজন ছিলেন সে মজলিসে। মধ্য-মণি হয়ে বসে আছেন নজরুল। কথায় কথায় হঠাৎ কবি বললেন: "করটিয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ সাহেব আমাকে একখানা পত্র লিখেছিলেন অনেকদিন আগে। দীর্ঘ পত্র। এ-পর্যন্ত তার জওয়াব দেয়া হয়নি।"

আড্ডার মোড় ঘুরে গেলো। নতুন আলাপের সন্ধান পেয়ে সবাই যেন ক্ষেপে উঠলেন। বললেন: "কৈ সে চিঠি? কোথায় সে চিঠি?"

কবি বললেন: "চিঠিখানা আমি খুব যত্ন করে রেখেছি। আপনাদের দেখাবো বলে আজ সঙ্গেই এনেছি।"

তিনি চিঠিখানা পকেট থেকে বের করে সবার সামনে ধরলেন। সবাই যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ওঁর উপর। টানাটানি করতে গিয়ে চিঠিটার একটা কোণ বোধহয় ছিঁড়েও গিয়েছিল।

চিঠিখানা কবিই পড়লেন। এতে ভাগ্যহীন মুসলমান সমাজের অগ্রগতিকে জোরালো করবার জন্য কবিকে নিশানবরদার হতে আহ্বান করা হয়েছিল।

সবাই প্রায় একযোগে বলে উঠলেন: "এ-চিঠিখানা সওগাতে প্রকাশ করা হোক।"

কিছুদিন থেকেই রক্ষণশীল দল—বিশেষ করে ধর্মান্ধ মুসলমানদের

তরফ থেকে নজরুলের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। এই সময় প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের পত্রখানা নজরুল-সমর্থনের যে সুর বহন করে নিয়ে এলো, তা' ঐ আন্দোলনকে ব্যাহত করতে হয়তো কিছুটা সাহায্য করতে পারে। বিশেষ করে তিনি এই পত্রে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তাতে মনে হলো, সারা মুসলিম-তরুণের মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন তিনি।

তাই অনেকে পত্রখানা সাধারণ্যে প্রকাশ কবতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। কিন্তু এক দিকের মনোভাব জানলে তো চলবে না। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বক্তব্য সম্বন্ধে কবির মনোভাব কি, তা-ও জানা দরকার। শুধু মৌখিক আলোচনায় এ-সব হয় না। তাই আসরের কেউ কেউ বললেন—প্রিন্সিপ্যাল সাহেবেব পত্রখানার জওয়াব কবিব লেখা উচিত। আর তা-ও এই সঙ্গে প্রকাশ করা উচিত। সবাই হর্ষধ্বনি করে এ কথার সমর্থন করলেন।

এর পর প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের পত্রখানা উত্তরসহ যথাসময়ে 'সওগাতে' প্রকাশিত হলো। এই দু'খানা পত্র সেদিন সারা বাঙলা দেশে একটা বিরাট আলোচনার সৃষ্টি করেছিল। রক্ষণশীলদের নেতৃবৃন্দ 'উল্টো বুঝলি রামে'র দশায় সম্ভবতঃ পড়েছিল। তাই উভয়কেই সেদিন তাঁদের বিষদৃষ্টিতে নতুন ক'রে পড়তে হয়েছিল। পত্র দু'খানির ঐতিহাসিক মূল্য আছে বিবেচনা ক'রে নিচে তা' হুবহু উদ্ধৃত ক'রে দিলাম। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের পত্রখানি এই:

"ভাই নজরুল ইসলাম,

তোমায় কখনো দেখিনি। অনেকবার দেখা করার সুযোগ খুঁজেছি, সে সুযোগ ঘটে ওঠে নাই,—দূর হতে শুধু তোমার লেখা পড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ঐ প্রতিভার কাছে বার বার মস্তক নত করেছি, আর আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছি, 'প্রভো, এ কাঙাল বাঙালী মুসলিম সমাজকে যদি একটি রত্ন দিয়েছ একে রক্ষা ক'রো—সমাজকে দিয়ে ওর কদর ক'রে নিও।' তোমায় এত আপন

ভাবি, এত কদর বলেই আজ অকুণ্ঠিতচিত্তে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছি। তোমার গুণমুগ্ধ, তোমার প্রীতি-আকাঙ্ক্ষী, ভক্ত ভাই-এর এ আবদার তুমি রক্ষা করবে তা-ও জানি।

আজ তোমায় কয়টি কথা বলব,—গুরুরূপে নয়, ভাইরূপে, ভক্ত-রূপে। এ কথাগুলি বলব বলে অনেকবার তোমার সাক্ষাৎ খুঁজেছি, পাই নাই ; কিন্তু কথাগুলিও বুকের তলে অনুদিন তোলপাড় করছে।

আমি আগেই বলেছি বাঙলার মুসলমান সমাজ কাঙাল ; শুধু ধনে নয়, মনেও। তাই বাঙলার অ-মুসলমানরা তোমার যে-কদর করেছেন, মুসলিমরা তা' করেন নাই, করতে শেখেন নাই। এ কথা ভেবে অনেক সময় লজ্জায় মাথা নত করেছি, সমাজকে নিন্দা করেছি, তাই পত্র মারফতেই বলতে চেষ্টা করছি।

বন্ধু-মহলে রোষ প্রকাশ করেছি। কিন্তু সে শুধু নিন্দায় ফায়দা কি ? শুধু আস্ফালনে ফল কি ? সমাজ যে পতিত, দয়ার পাত্র, তাই সেইভাবে তাকে কখনও স্নেহের হাত বুলিয়ে, কখনও জোরে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হবে, পথে আনতে হবে। আর তাদের কাছে ত আমার সে আবদারের অধিকার নাই, যে-আবদার তোমার কাছে আমি করতে পারি ; তাই এবার সমাজকে ছেড়ে তোমার দিকে ফিরছি। সমাজ মরতে বসেছে। তাকে বাঁচাতে হলে চাই সঞ্জীবনী-সুধা,—কে সেই সুধার পাত্র হাতে এনে এই মরণোন্মুখ সমাজের সামনে দাঁড়াবে, কোন্ সু-সন্তান আপন তপোবলে গঙ্গা আনয়ন ক'রে এ-অগণ্য সগর-গোষ্ঠীকে পুনর্জীবন দান করবে, কাঙাল সমাজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে করুণ নয়নে সেই প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। কে জানি না ; কিন্তু মনে হয়, তোমায় বুঝি খোদা সে সুধাভাণ্ডের কিঞ্চিৎ দান করেছেন, অন্তরের অন্তরালে বুঝি সে সাধনার বীজ জমা আছে। হাত বাড়াবে কি ? একবার সাহসে বুক বেঁধে সে তপশ্চারণে মনোনিবেশ করবে কি ?

সুদূর অতীত ইতিহাসের প্রান্তসীমার ওপার হ'তে যে অস্পষ্ট,

অর্ধশ্রুত মায়াধ্বনি ভেসে আসে, সে কবির কণ্ঠস্বর!—কবি যে যুগে যুগে সত্যের গীতি, কল্যাণের গীতি, বিরাট অনন্ত মহাজীবনের নিগূঢ় ভিত্তি কর্মের উদ্বোধন-গীতি গেয়ে এসেছে। স্নেহ-বাৎসল্য-ভরপুর মাতৃ-ক্রোড়ে আধনিমীলিত আঁখি শিশুর শয্যাপার্শ্বে, নবীন-নবীনার মিলন তীর্থ বিবাহ-বাসরে, ধর্মযাজকের উন্নত বেদীতে, কর্মবীরের উলঙ্গ অসি-বর্শার রঙ্গ-ভূমি যুদ্ধক্ষেত্রে, সমর-শেষে বিজয়ের উল্লাস-নিনাদে, শহীদের শোকে, নিহতের কল্যাণ-কামনায়, মহাযাত্রীর সমাধি-ধারে কবির লীলায়িত বাণী-ধ্বনি যুগে যুগে ঝঙ্কৃত হয়েছে; মহামানবের মনোজ্ঞ ক'রে যখনই তিনি যে বাণী প্রচার করতে চেয়েছেন, তিনি যত বড় মহাসত্যই প্রচার করুন না, তিনি কবির লালিত্যে মধুর ক'রে তা' বলতে চেয়েছেন—বলেছেন। কারণ বিশিষ্ট শক্তি-স্ফূরিত স্বল্প-সংখ্যক বিশেষজ্ঞ রসশূন্য নির্মম বাণীর মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু বিশ্বমানবের চিত্ত স্পর্শ করতে হলে সেই ভাব-উদ্বেল-চঞ্চল তরঙ্গায়িত বচন-প্রবাহেই করতে হবে, যাকে ধরবার জন্য খোদাতা'লার স্থাপিত রাজধানী দুই পার্শ্বের বেতার স্টেশন দুইটি অনুদিন এত উদ্গ্রীব এবং যার মৃদু আঘাতে প্রাণের বীণার নীরব তারে সহসা আকুল রাগিণী-ঝঙ্কার জেগে উঠে মানব-দেহের স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উন্মাদনার তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়ে দেয়। তুমি সেই কবিদের একজন, তোমার কণ্ঠে সেই সঞ্জীবনী-উন্মাদনা আছে।

কিন্তু ভাই, তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, কোন্ ব্রতে তোমার সে কণ্ঠস্বর তুমি নিয়োজিত করেছ? তোমার প্রতিভা অদ্ভুত, কিন্তু তার চেয়ে গুরুতর তোমার দায়িত্ব! কড়ির মালিক যে, তার নিকাশ না নিলেও বড় আসে যায় না, কিন্তু মাণিকের মালিকের নিকাশ দিতেই হবে, তোমার প্রতিভাকে তো তোমায় সার্থক করতেই হবে।

কোন্ পথে সে সার্থকতার অন্বেষণ করবে? বিদ্রোহে? উত্তম, কিন্তু বিদ্রোহকেও সুনিশ্চিত উদ্দেশ্যযুক্ত করতে হবে,—শুধু তোমার 'যখন চাহে এ মন যা' 'উন্মাদ' ঝঞ্ঝার মত চললে তোমার জীবনের

সার্থকতার নৈকট্য কোথায়? তৈমুরের বিরাট দুর্বার অভিযানের দিকে আমরা বিস্ময়ে চেয়ে থাকি, তারপর ক্লান্ত চোখ ফিরিয়ে নিই, তারপর তার কথা ভুলে যাই; কিন্তু বাবরের ক্ষুদ্রতর অভিযানের কথা ভুলতে পারি না।—তাঁর অভিযান আমাদিগকে দিয়েছে দিল্লী, আগ্রা, ময়ূরাসন, সর্বোপরি দিয়েছে তাজমহল। তোমার কাছে আমরা চাই বাবরের অভিযান যে অভিযানের দক্ষিণে, বামে, অগ্রে, পশ্চাতে নব সৃষ্টির সৌধ গড়ে ওঠে।

বাঙলার মুসলিমরা তোমার সম্যক কদর করে নাই, কিন্তু তাই কি তাদের তুমি ছেড়ে যাবে? তোমার ক্ষেত্র মুসলিম সাহিত্যে—বাঙালী মুসলিম চেয়ে আছে তোমার কণ্ঠ দিয়ে ইসলামের প্রাণবাণী পুনঃ প্রতিধ্বনিত হবে, ইসরাফীলের শিঙ্গার মত সেই প্রতিধ্বনি এই নিদ্রিত সমাজকে মহা আহ্বানে জাগ্রত করবে। বাঙলার আর দশজন কবির মত যদি তুমি কবিতা লেখ, তবে তোমার প্রতিভা আছে, স্থায়ী আসন তুমি পাবে, কিন্তু সে-আসন মাত্র সিংহাসন নয়; আজ বাঙলার মুসলমান-সাহিত্যরাজ্যে সিংহাসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি শুধু দখল করলেই হয়। মধুসূদন যদি শুধু ইংরাজী কাব্যই লিখতেন, তবে হয়ত একজন বায়রণ হতে পারতেন, কিন্তু মধু-চক্র রচয়িতা হতে পারতেন না। কিন্তু আমি শুধু যশের, শুধু প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে এ প্রশ্নের বিচার করছি না। আমার বক্তব্য এই, যেখানে দশটা অভাব আছে, সেখানে যদি সব অভাবগুলি একসঙ্গে দূর না করা যায়, তবে যেটি সবচেয়ে বড় অভাব, সেইটি আগে দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

এখন বিচার করতে হয়, তুমি বাঙালী, তুমি কবি, তুমি মুসলমান, বাঙলার কোন্ কল্যাণসাধনে তোমার আগে অগ্রসর হওয়া দরকার।

বাঙালীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ, সবচেয়ে বেশী আত্মভোলা তোমারই ভাই এই মুসলিমগণ। আর বাঙলা-সাহিত্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত, সবচেয়ে নিন্দিত, কু-লিখিত বিষয় ইসলাম। যিনি বাঙলা-সাহিত্যে ইসলামের সত্যসনাতন নিষ্কলঙ্ক চিত্র দান করবেন, যিনি

'এই সব মূক ম্লান মুখে' ভাষা দিবেন, 'এই সব ভগ্ন শুষ্ক শ্রান্ত বুকে' আশা ধ্বনিয়ে তুলবেন, যিনি ইসলামের সত্য স্বরূপ দেশের সম্মুখে ধরে মুসলিমের বুকে বল দেবেন, অ-মুসলিমের বুক হতে ইসলাম-অশ্রদ্ধা দূর করতঃ হিন্দু-মুসলমান মিলনের সত্য ভিত্তির পত্তন করবেন, তিনিই হবেন বর্তমানে শ্রেষ্ঠতম দেশ-হিতৈষী, তিনিই হবেন বাঙালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূত। তুমি চেষ্টা করলে তাই হতে পার, তুমি সেই মহা গৌরবের আসন দখল করতে পার। তুমি এইরূপে তোমার কবি-প্রতিভাকে, তোমার জীবনকে, তোমার মানবতাকে সহজতম-রূপে সার্থক করতে পার।

আরো এক কথা। এই বাঙালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূতরূপে যে তুমি আসবে, সে কোন্ পথে? বিদ্রোহের পথে? আমার মনে হয় - না, তা' নয়। ইংরাজীতে একটা কথা আছে Line of least resistance বা লঘুতম বাধার পথে অগ্রসর হওয়া সমীচীন। ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কিছু নাই, ইসলাম আধুনিকতম উন্নততম ধর্ম। তবে যে বাঙলার মুসলিমরা অনেক কুসংস্কারে পড়েছে, সে ইসলামের দোষ নয়, এই হতভাগারা ইসলামের সাথে ঐ কুসংস্কার-গুলি পোষণ করেছে। এখন ঐ কুসংস্কারগুলি দূর করতেই হবে, কিন্তু সেগুলি ইসলামের অনুশাসন নয় বরং ইসলামের বিরুদ্ধ মত, এই বলে সেগুলির নিন্দা করতে হবে—ইসলামকে, ইসলামের কোন অনুষ্ঠানকে নিন্দা ক'রে নয়। কারণ যারা কুসংস্কারে ডুবে ইসলামের পবিত্র নামে হয়ত অজ্ঞাতে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করছে, তারাও নিন্দার ইসলামের নিন্দা সইতে পারে না, সুতরাং ইসলামের নামে খুব ভালো কথা বললেও তারা শুনবে না, যাদের শুনবার জন্য বলা তারাই যদি না শুনে, তবে সে-বলায় লাভ কি? কিন্তু মুসলিমদের একটা গুণ আছে, সে ধর্মের নামে পাগল হয়; তাই সে হাফিজ-রুমীকে সত্য-সাধক বলে বরণ ক'রে নিয়েছে; তাই সে শেখ সাদীকে দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজে আদর্শ করেছে। তোমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা

'বিদ্রোহী' হয়েছিলেন, তাঁদেরই একজন তোমার 'খুবেহ উম্মিদ' পড়ে আনন্দে গর্বে লাফিয়ে উঠেছিলেন,—আর নাচতে নাচতে এসে আমায় বলেছিলেন, নজরুল যদি এমনিধারা লিখত, তবে বাঙলার আলিমরা যে তাকে মাথায় ক'রে রাখত (যিনি বলেছিলেন, তিনি একজন আলিম)। এ-কথা কয়টি তোমায় ভেবে দেখতে বলি। বাঙলার মৌলানা রুমীর আসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি তাই দখল ক'রে ধন্য হও, বাঙলার মুসলিমকে, বাঙলার সাহিত্যকে ধন্য কর।

তাই আজ বড় আশায়, বড় ভরসায়, বড় সাহসে, বড় মিনতির স্বরে তোমায় বলছি,—ভাই কাঙাল মুসলিমের বড় আদরের ধন তুমি, তুমি এইদিকে পতিত মুসলিম-সমাজের দিকে, এই অবহেলিত ইসলামের দিকে একবার চাও ; তাদের ব্যথিতচিত্তের করুণ রাগিণী তোমার কণ্ঠে ভাষা লাভ ক'রে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে তুলুক, তাদের সুপ্ত প্রাণের জড়তা তোমার আকুল আহ্বানের উন্মাদনায় চেতনাময়ী হউক, ইসলামের মহান্ উদার উচ্চ আদর্শ তোমার কবিতায় মূর্তি লাভ করুক, তোমার কাব্য-সাধনা ইসলামের মহানীতিতে চরম সার্থকতায় ধন্য হোক। আমীন!

অনেক কথা বলে ফেললাম ভাই—মাফ ক'রো। ভাইয়ের কাছে ভাই যদি এমন প্রাণ-খুলে কথা না বলবে, তবে বলবে কোথায়!"

নজরুল ইসলাম পত্রখানার উত্তর দেন এভাবে ঃ

"শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপ্যাল ইবরাহিম খান সাহেব!

আমাদের আশি বছরে নাকি স্রষ্টা ব্রহ্মার একদিন। আমি অত-বড় স্রষ্টা না হলেও স্রষ্টা তো বটে, তা' আমার সে-সৃষ্টির পরিসর যত ক্ষুদ্র পরিধিই হোক। কাজেই আমারও একটা দিন অন্ততঃ তিনটে বছরের কম যে নয় তা' অন্য কেউ বিশ্বাস করুক চাই না করুক, আপনি নিশ্চয়ই করবেন।

আপনার ১৯২৫ সালের লেখা চিঠির উত্তর দিচ্ছি ১৯২৭ সালের আয়ু যখন ফুরিয়ে এসেছে তখন। এমনও হতে পারে ১৯২৭-এর সাথে সাথে হয়তবা আমারও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, তাই আমি আমারও অজ্ঞাতে, কোনো অনির্দেশের ইঙ্গিতে আমার শেষ বলা বলে যাচ্ছি আপনার চিঠির উত্তর দেওয়ার সুযোগে। কেন না আমি এই তিন বছরের মধ্যে কারুর চিঠির উত্তর দিয়েছি, এতবড় বদনাম আমার শত্রুতেও দিতে পারবে না—বন্ধুরা তো নয়ই। অবশ্য আয়ু আমার ফুরিয়ে এসেছে—এ সুসংবাদটা উপভোগ করবার মত সৎসাহস আমার নেই, বিশ্বাসও হয়ত করিনে; কিন্তু আমারই স্বজাতি অর্থাৎ কবি জাতীয় অনেকেই এ-বিশ্বাস করেন এবং আমিও যাতে বিশ্বাস করি—তার জন্যে অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণেই করছেন। কিন্তু আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে, তাঁরা যে নিঃশ্বাস মোচন করেন, তা' হ্রস্ব নয় এবং সে নিঃশ্বাস বিশ্বাসীরও নয়। হতভাগা আমি, তাঁদের এই আমার প্রতি অতি মনোযোগ নাকি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারিনে—মন্দলোকে এমন অভিযোগও করেছে তাঁদের দরবারে।

লোকে বললেও আমি মনে করতে ব্যথা পাই যে, তাঁরা আমার শত্রু! কারণ, একদিন তাঁরাই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আজ যদি তাঁরা সত্যি সত্যিই আমার মৃত্যু কামনা করেন, তবে তা' আমার মঙ্গলের জন্যই, এ আমি আমার সকল হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি। আমি আজও মানুষের প্রতি আস্থা হারাইনি—তাদের হাতের আঘাত যত বড় এবং যতই বেশী পাই। মানুষের মুখ উল্টে গেলে ভূত হয়, বা ভূত হলে তার মুখ উল্টে যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয় উল্টে গেলে সে যে ভূতের চেয়েও কত ভীষণ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে তা-ও আমি ভাল করেই জানি। তবু আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি—ভালবাসি। স্রষ্টাকে আমি দেখিনি, কিন্তু মানুষকে দেখেছি। এই ধূলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করবে, চির-রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধুলোর নীচে স্বর্গ

টেনে আনবে এ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি আমাকে অনুভব করি, এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনে, এই ব্যথিতের অশ্রুজলের মুকুরে যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিছু করতে যদি না পারি, ওদের সাথে প্রাণভরে যেন কাঁদতে পাই!

কিন্তু এ তো আপনার চিঠির উত্তর হচ্ছে না। দেখুন, চিঠি না লিখতে লিখতে চিঠি লেখার কায়দাটা গেছি ভুলে। তাতে করে কিন্তু লাভ হয়েছে অনেক। যদিও চোখ-কান বুজে উত্তর দিয়ে ফেলি কারুর চিঠির, সে উত্তর পড়ে তাঁর প্রত্যুত্তর দেবার মত উৎসাহ বা প্রবৃত্তির ইতি ঐখানেই হয়ে যায়! কেন না সেটা তাঁর চিঠির উত্তর ছাড়া আর সব কিছুই হয়। এ-বিষয়ে ভুক্তভোগীর সাক্ষ্য নিতে পারেন। সুতরাং এটাও যদি আপনার চিঠির উত্তর না হয়ে আর কিছুই হয়, তবে সেটা আপনার অদৃষ্টের দোষ নয়, আমার হাতের অখ্যাতি।

আমাদের দেখা না হলেও শোনার ত্রুটি কোনো পক্ষ থেকেই ঘটেনি দেখছি। আপনাকে চিনি, আপনি আমায় যতটুকু চেনেন তার চেয়েও বেশী করে; কিন্তু জানতে যে আজও পারলাম না, তার জন্য অভিযোগ আমার অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাকে করব বলুন। এতদিন ধরে বাঙলার এত জাগয়া ঘুরেও যখন আপনার সঙ্গে দেখা হলো না, তখন আর যে হবে আশা রাখিনে। বিশেষ ক'রে—আজ যখন ক্রমেই নিজেকে জানাশোনার আড়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ ভালই হয়েছে অন্তত আপনার দিক থেকে। আমার দিকের ক্ষতিটাকে আমি সইতে পারব এই আনন্দে যে, আপনার এত শ্রদ্ধা অপাত্রে অর্পিত হয়েছে বলে দুঃখ করবার সুযোগ আপনাকে দিলাম না। এ আমার বিনয় নয়, আমি নিজে অনুভব করেছি যে, আমায় শুনে যারা শ্রদ্ধা করেছেন, দেখে তাঁরা তাঁদের সে শ্রদ্ধা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাই আমি আজ অন্তরে অন্তরে প্রার্থনা করছি,

কাছে থেকে যাঁদের কেবল ব্যথাই দিলাম, দূরে গিয়ে অন্ততঃ তাঁদের সে দুঃখ ভুলবার অবসর যদি না দিই, তবে মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসা সত্য নয়।

তা ছাড়া নৈকট্যের একটা নিষ্ঠুরতা আছে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় কলঙ্ক নেই, কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক আছে। দূর থেকে চাঁদ চক্ষু জুড়ায়, কিন্তু মৃত চন্দ্রলোকে গিয়ে কেউ খুশী হয়ে উঠবেন বলে মনে হয় না। বাতায়ন দিয়ে যে সূর্যালোক ঘরে আসে তা' আলো দেয়, কিন্তু চোখে দেখার সূর্য দগ্ধ করে। চন্দ্র সূর্যকে আমি নমস্কার করি, কিন্তু তাঁদের পৃথিবী দর্শনের কথা শুনলে আতঙ্কিত হয়ে উঠি। ভালোই হয়েছে ভাই, কাছে গেলে হয়ত আমার কলঙ্কটাই বড় হয়ে দেখা দিত।

তারপর শ্রদ্ধার কথা। ওদিক দিয়ে আপনার জিতে যাবার কোন আশা নেই বন্ধু। শ্রদ্ধা যদি ওজন করা যেত, তা' হলে আমাদের দেশের একজন প্রবীণ সম্পাদক—যিনি মানুষের দোষ গুণ বানিয়ার মত ক'রে কড়ায় গণ্ডায় ওজন করতে সিদ্ধহস্ত, তাঁর কাছে গিয়েই এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যেত! গ্রহের ফেরে তাঁর কাঁচি-পাকি ওজনের ফের আমার পক্ষে কোনদিনই অনুকূল নয়, তা সত্ত্বেও আপনিই হারতেন এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি।

হঠাৎ মুদির প্রসঙ্গটা এসে পড়বার কারণ আছে, বন্ধু। জানেনই তো, আমরা কানাকড়ির খরিদ্দার। কাজেই ওজনে এতটুকু কম হতে দেখলে প্রাণটা ছ্যাঁক ক'রে ওঠে। মুদিওয়ালার ওতে লাভ কতটুকু জানিনে, কিন্তু আমাদের ক্ষতির পরিমাণ আমরা ছাড়া কেউ বুঝবে না,—মুদিওয়ালা তো নয়ই। তবু মুদিওয়ালাকে তুল দাঁড়ি ধরতে দেখলে একটু ভরসা হয় যে, চোখের সামনে অতটা ঠকাতে তার বাধবে, কিন্তু তার পাঁচসিকে মাইনের নোংরা চাকরগুলো যখন দাঁড়ি পাল্লার মালিক হয়ে বসে, তখন আর কোন আশা থাকে না। আগেই বলেছি, আমরা দরিদ্র খরিদ্দার। থাকত বড় বড় মিঞাদের মত সহায় সম্বল, তা' হলে এ অভিযোগ করতাম না।

পায়াভারী লোকের ভারী সুবিধে। তা' সে পায়াভারী পায়ে ফাইলেরিয়া-গোদ হয়েই হোক, বা ভার গুণেই হোক। এঁদের তুলতে হয় কাঁধে ক'রে আর কাছে যেতে হয় মাথাটা ভুঁই সমান নীচু ক'রে। ব্যাবসা যারা বোঝে, তারা অন্য দোকানীর বড় খদ্দেরকে হিংসা ও তজ্জনিত ঘৃণা যতই করুক, তাঁকে নিজের দোকানে ভিড়োতে—তার দোকানের সবটুকু তেল তার ভারী-পায়ে খরচ করতে তার এতটুকু বাধে না! দরকার হলে তার পুত্র ছোটে তেলের টিন ঘাড়ে করে, সাঁতরে পার হয় রূপনারায়ণ নদ, তাঁর ভারী-পায়ে ঢালে তৈল,—তা' সে পা যতই কেন ঘানি-গাছের মত অবিচলিত থাকে। সাথে সে ভাঁড় ও স্তুতি গাইয়ে নিয়ে যেতেও ভুলে না।

যাক এখন এসব বাজে কথা। অনেক কথার উত্তর দিতে হবে।

আমি আপনার মত অসঙ্কোচে 'তুমি' বলতে পারলাম না বলে ক্ষুণ্ণ হবেন না যেন। আমি একে পাড়াগেঁয়ে স্কুল-পালানো ছেলে, তার ওপর পেটে ডবুরি নামিয়ে দিলেও 'ক'-অক্ষর খুঁজে পাওয়া যাবে না (পেটে বোমা মারার উপমাটা দিলাম না স্পেশাল ট্রিবিউনালের ভয়ে)। যদি বা 'খাজা' বা ইবরাহিম খানকে 'তুমি' বলতে পারতাম, কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের নাম শুনেই আমার হাত পা একেবারে পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেছে! আরে বাপ্! স্কুলের হেডমাস্টারের চেহারা মনে করতেই আমার আজও জলতেষ্টা পেয়ে যায়, আর কলেজের প্রিন্সিপাল, সে না জানি আরও কত ভীষণ! আমার স্কুল জীবনে আমি কখনও ক্লাসে বসে পড়েছি, এত বড় অপবাদ আমার চেয়ে এক নম্বর কম পেয়ে যে 'লাষ্ট বয়' হয়ে যেত—সেও দিতে পারবে না। হাই বেঞ্চের উচ্চাসন হতে আমার চরণ কোনদিনই টলেনি, ওর সাথে আমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেছিল। তাই হয়ত আজও বক্তৃতামঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলে মনে হয়, মাস্টারমশাই হাইবেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

যার রক্তে রক্তে এত শিক্ষক-ভীতি তাকে আপনি সাধ্যসাধনা করেও 'তুমি' বলাতে পারবেন না, এ স্থির নিশ্চিত।

এইবার পালা শুরু।

বাংলার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কি না জানিনে, কিন্তু মনে যে কাঙাল এবং অতি মাত্রায় কাঙাল, তা' আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব ক'রে আসছি বহুদিন হতে। আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে, তা' আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোনোদিন অভিযোগ করেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের আখ্যায় বিভূষিত হবার মত তো আমি হইনি। অথচ হাফেজ-খৈয়াম-মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাথে কাফেরের পংক্তিতে উঠে গেলাম!

হিন্দুরা লেখক-অলেখক জনসাধারণ মিলে যে-স্নেহে যে-নিবিড় প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে আমায় এত বড় ক'রে তুলেছেন, তাঁদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি, তা'হলে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য কয়েকজন নোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হ'তে ইতর ভাষায় গালাগালি করেছেন, এবং কয়েকজন গোঁড়া 'হিন্দুসভাওয়ালা' আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনাও ক'রে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এঁদের আঙুল দিয়ে গোণা যায়। এদের আক্রোশ সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত। এঁদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দুসমাজকে দোষ দিই না এবং দেবও না। তা'ছাড়া, আজকের সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে আমি যে মুসলমান এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ—আমি যত বেশী অসাম্প্রদায়িক হই না কেন।

প্রথম গালাগালির ঝড়টা আমার ঘরের দিক অর্থাৎ মুসলমানের দিক থেকেই এসেছিল—এটা অস্বীকার করিনি, কিন্তু তাই বলে মুসলমানেরা যে আমায় কদর করেন নি, এটাও ঠিক নয়। যাঁরা

দেশের সত্যিকার প্রাণ, সেই তরুণ মুসলিম-বন্ধুরা আমায় যে-ভালোবাসা, যে-প্রীতি দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন, তাতে নিন্দার কাঁটা বহু নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রবীণদের আশীর্বাদ—মাথার মণি হয়ত পাইনি, কিন্তু তরুণদের ভালোবাসা, বুকের মালা আমি পেয়েছি। আমার ক্ষতির ফুলের ফসল ফলেছে।

এই তরুণদেরই নেতা ইব্রাহিম খান, কাজী আবতুল ওতুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর, ওয়াজেদ আলি, আবুল হোসেন। আর এই বন্ধুরাই তো আমায় বড় করেছেন, এই তরুণদের বুকে আমার জন্য আসন পেতে দিয়েছেন—প্রীতির আসন! ঢাকা, চট্টগ্রাম নোয়াখালী, ফরিদপুরে যারা তাদের গলার মালা দিয়ে আমায় বরণ করল, তারা এই তরুণেরই দল। অবশ্য এ তরুণের জাত ছিল না। এ ছিল সকল জাতির।

সকলকে জাগাবার কাজে আমায় আহ্বান করেছেন। আমার মনে হয়, আপনাদের আহ্বানের আগেই আমার ক্ষুদ্র শক্তির সবটুকু দিয়ে এদের জাগাবার চেষ্টা করেছি—শুধু যে লিখে, তা' নয়,—আমার জীবনী ও কর্মশক্তি দিয়েও।

আমার শক্তি স্বল্প, তবু এই আট বছর ধরে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক-শ্রমিক তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি—লিখেছি, বলেছি, চারণের মত পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। অর্থ আমার নেই, কিন্তু সামর্থ্য যেটুকু আছে, তা' ব্যয় করতে কুণ্ঠিত কোন দিন হয়েছি, এ বদনাম আর যেই দিক, আপনি দেবেন না বোধহয়। আমার এই দেশ-সেবার, সমাজ-সেবার 'অপরাধের' জন্য শ্রীমৎ সরকার বাবাজীর আমার উপর দৃষ্টি অতি মাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আমার সবচেয়ে চলতি বইগুলোই গেল বাজেয়াপ্ত হয়ে। এই সে-দিনও পুলিশ আবার আমায় জানিয়ে দিয়েছে, আমার নব-প্রকাশিত 'রুদ্র-মঙ্গল' আর বিক্রি করলে আমাকে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত করা হবে। আমি যদি পাশ্চাত্য ঋষি হুইট্‌ম্যানের সুরে সুর মিলিয়ে বলি :

'Behold, I do not give a little charity,

when I give, I give myself,

তা' হলে সেটাকে অহঙ্কার বলে ভুল করবেন না।

আপনি সমাজকে 'পতিত, দয়ার পাত্র' বলেছেন। আমিও সমাজকে পতিত demoralized মনে করি—কিন্তু দয়ার পাত্র মনে করতে পারিনে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আমার সমাজকে মনে করি ভয়ের পাত্র। এ-সমাজ সর্বদাই আছে লাঠি উঁচিয়ে; এর দোষ-ত্রুটির আলোচনা করতে গেলে নিজের মাথা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আপনি হয়ত হাসবেন, কিন্তু, আমি তো জানি আমার শির লক্ষ্য ক'রে কত ইট-পাটকেলই না নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আমার কি মনে হয় জানেন? স্নেহের হাত বুলিয়ে এ পচা সমাজের কিছু ভালো করা যাবে না।• যদি সে রকম 'সাইকিক-কিওর'-এর শক্তি কারুর থাকে, তিনি হাঁত বুলিয়ে দেখতে পারেন। ফোড়া যখন পেকে পচে ওঠে, তখন রোগী সবচেয়ে ভয় করে অস্ত্র-চিকিৎসককে। হাতুড়ে ডাক্তার হয়ত তখনো আশ্বাস দিতে পারে যে, সে হাত বুলিয়েই ঐ গলিত ঘা সারিয়ে দেবে এবং তা শুনে রোগীরও খুশী হয়ে উঠারই কথা। কিন্তু বেচারী 'অবিশ্বাসী' অস্ত্র-চিকিৎসক তা' বিশ্বাস করে না। সে বেশ ক'রে তার ধারালো ছুরি চালায় সেই ঘায়ে। রোগী চেঁচায়, হাত-পা ছোঁড়ে, গালি দেয়। কিন্তু সার্জন তার কর্তব্য ক'রে যায়। কারণ সে জানে, আজ রোগী গালি দিচ্ছে, দু'দিন পরে ঘা সেরে গেলে সে নিজে গিয়ে তার বন্দনা ক'রে আসবে।

আপনি কি বলেন? আমি কিন্তু অস্ত্র-চিকিৎসার পক্ষপাতী। সমাজ তো হাত-পা ছুঁড়বেই, গালিও দেবে; তা' সইবার মত শক্ত চামড়া যাঁদের নেই তাঁদের দিয়ে সমাজ-সেবা হয়ত চলবে না। এই জন্যেই আমি বারে বারে ডাক দিয়ে ফিরছি নির্ভিক তরুণ ব্রতীদলকে। এই সংস্কার সম্ভব হবে শুধু তাদের দিয়েই। এরা যশের কাঙাল নয়, মানের ভিখারী নয়। দারিদ্র্য সইবার মত পেট, আর মার সইবার

মত পিঠ যদি কারুর থাকে, তো এই তরুণদেরই আছে। এরাই সৃষ্টি করবে নূতন সাহিত্য, এরাই আনবে নূতন ভাবধারা, এরাই গাইবে 'তাজা-বতাজা'র গান।

আপনি হয়ত আমায় এদেরই অগ্রনায়ক হতে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু আপনার মত আমিও ভাবি, আজও ভাবি যে, কে সে ভাগ্যবান এদের অগ্রনায়ক। আমার মনে হয়, সে ভাগ্যবান আজও আসেনি। আমি অনেকবার বলেছি, আজও বলছি—সে ভাগ্যবানকে আমি দেখিনি, কিন্তু দেখলে চিনতে পারব। আমার বাণী—তাঁরই আগমনী-গান। আমি তারই অগ্রপথিক তূর্যবাদক। আমার মনে হয় সে ভাগ্যবান পুরুষেরই ইঙ্গিতে আমি শুধু গান গেয়ে গেয়ে চলেছি—জাগরণী গান। আঘাত, নিন্দা, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা দশদিক হতে বর্ষিত হচ্ছে আমার ওপর, তবু আমি তার দেওয়া তূর্য বাজিয়ে চলেছি। এ বিশ্বাস কোথা হ'তে কি ক'রে যে আমার মাঝে এল, তা' আমি নিজেই জানিনে। আমার শুধু মনে হয়, কার যেন আদেশ—কার যেন ইঙ্গিত আমার বেদনার রন্ধ্রপথে নিরন্তর ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তাঁর আসার পদধ্বনি আমি নিরন্তর শুনছি আমার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি আক্ষেপে।

তবে, এও আমি বিশ্বাস করি, সেই অনাগত পুরুষের, আমাদের যে-কারুর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করা বিচিত্র নয়।

আমি এতদিন তাঁকে খুঁজেছি আমারও ঊর্ধ্বে। তাঁকে আমারই মাঝে খুঁজতেও হয়ত চেয়েছি। দেখা তাঁর পেয়েছি এমন কথা বলব না, তবে এ-কথা বলতেও আমার আজ দ্বিধা নেই যে, আমি ক্রমেই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করছি। এমনো মনে হয়েছে কতদিন, যেন আর একটু হাত বাড়ালেই তাঁকে ধরতে পারি।

আপনার 'হাত বাড়াবে কি ?' কথাটা আমায় সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আমি খুঁজে ফিরছি নিরাশ-হতাশ্বাসে সে নিশ্চিন্ত শান্তি—যার ধ্যানলোকে বসে আমি তপস্যা-প্রোজ্জ্বলনেত্রে আমার

অবহেলিত আমাকে খুঁজে দেখবার অবকাশ পাব। এ-শান্তি আমার এ-জীবনে পাব কিনা জানি না; যদি পাই—আপনার জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর দিয়ে যাব সে-দিন।

আপনার কয়েকটি মৃদু অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করব এইবার।

আপনি আমার যে-দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন, সে দায়িত্ব আমার সত্যিকার কাব্য-সৃষ্টির, না সমাজ-সংস্কারের? আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানিনে, জানলেও মানিনে।

'এই সৃষ্টি করলে আর্টের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকে, এই সৃষ্টি করলে আর্ট ঠুঁটো হয়ে পড়ে'—এমনিতর কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বলগা ক'সে ক'সে আর্টের উচ্চৈঃশ্রবার গতি পদে পদে ব্যাহত ও আহত করলেই আর্টের চরম সুন্দর নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ হল—এ কথা মানতে আর্টিস্টের হয়ত কষ্টই হয়, প্রাণ তার হাঁপিয়ে ওঠে। জানি, ক্লাসিকের কেশো-রোগীরা এতে উঠবেন হাড়ে হাড়ে চ'টে, তাঁদের কলম হয়ে উঠবে বাঁশ। এরই মধ্যে হয়েও উঠেছে তাই। তবু আজ এ-কথা জোর গলায় বলতে হবে নবীনপন্থীদের! এই সমালোচকদের নিষেধের বেড়া যাঁরাই ডিঙিয়েছেন, তাঁদেরই এঁদের গোদা-পায়ের লাথি খেতে হয়েছে, প্রথম শ্রেণী হতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেমে যেতে হয়েছে।

বেদনা-সুন্দরের পূজা যাঁরাই করেছেন, তাঁদের চিরকাল একদল লোক হুজুগে বলে নিন্দা করেছে। আর, এরাই দলে ভারী। এরা মানুষের ক্রন্দনের মাঝেও সুর-তাল-লয়ের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে হল্লা করে যে, ও-কান্না হাততালি দেবার মত কান্না হল না বাপু, একটু আর্টিস্টিকভাবে নেচে নেচে কাঁদো। সকল সমালোচনার ওপরে যে বেদনা, তাকে নিয়েও আর্টশালারক্ষী—এই প্রাণহীন আনন্দ-গুণ্ডার কুশ্রী চীৎকারে হুইট্ম্যানের মত ঋষিকেও অ-কবির দলে পড়তে হয়েছিল।

আমার হয়েছে সাপের ছুঁচো-গেলা 'অবস্থা। 'সর্বহারা' লিখলে

বলে—কাব্য হল না, 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট' লিখলে বলে—ও হল ন্যাকামী। ও নিরর্থক শব্দ-ঝঙ্কার দিয়ে লাভ হবে কী? ও না লিখলে কার ক্ষতি হতো?

'লিরিক' নাকি 'লভ' এবং 'ওয়ার' নিয়ে। আমাদের দেশে যুদ্ধ নেই (হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ ছাড়া); কাজেই মানুষের নির্যাতন দেখে তার সেই মর্মব্যথার গান গাইলে এখানে হয় তা' 'বিভৎস বিদ্রোহ-রস'। ওটা দিয়ে নাকি মানুষের প্রশংসা সহজ-লভ্য হয় বলেই আজকালকার লেখকরা রসের চর্চা করে।

'আমার লেখা কাব্য হচ্ছে না, আমি কবি নই'—এ বদনাম সহ্য করতে হয়ত কোন কবিই পারে না। কাজেই যারা করছিল মানুষের বেদনার পূজা, তারা এখন করতে চাচ্ছে প্রাণহীন সৌন্দর্য সৃষ্টি। এমন একটা যুগ ছিল—সে সত্যযুগই হবে হয়ত—যখন মানুষের দুঃখ আজকের মত এত বিপুল হয়ে ওঠেনি। তখন মানুষ নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে ধ্যানের তপোবনে শান্ত সামগান গাইবার অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র মানুষ নিপীড়িত হ'তে লাগল, অমনি সৃষ্টি হল বেদনার মহাকাব্য,—রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড প্রভৃতি। আর তাতে সমাজের আজকালকার বেঁড়ে-ওস্তাদ সমালোচকদের তথাকথিত "বীভৎস বিদ্রোহ বা রুদ্র-রসের" প্রাধান্য থাকলেও—তা' কাব্য হয়নি, এমন কথা কেউ বলবে না।

এই বেদনার গান গেয়েই আমাদের নবীন সাহিত্য-স্রষ্টাদের জন্য নূতন সিংহাসন গড়ে তুলতে হবে। তারা যদি কালিদাস, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপস্রষ্টাদের পাশে বসতে নাই পায়—পুশকিন, দস্তয়ভস্‌কি, হুইট্‌ম্যান, গর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে ধূলির আসনে বসবার অধিকার তারা পাবেই। এই ধূলির আসনই একদিন সোনার সিংহাসনকে লজ্জা দেবে, এই তো আমাদের সাধনা।

দুঃখী বেদনাতুর হতভাগাদের একজন হয়েই বেদনার গান গেয়েছি—সে-গানে হয়ত রূপ-রং ফুটে ওঠেনি, আমি ভাল রংরেজ

নই বলে, কিন্তু সেই বেদনার সুরকে অশ্রদ্ধা করবার মত নীচতা মানুষের কেমন ক'রে আসে! অথচ এই সব গালাগালির বিপক্ষে কোনো প্রতিবাদও তো হ'তে দেখিনি।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণে এতটা বিচলিত হওয়া আমার উচিত হয়নি। আমার দিনের সূর্য ওদের শরনিক্ষেপে মুহূর্তের তরে আড়াল পড়লেও চিরদিনের জন্য ঢাকা পড়বে না—আমার এ বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এর জন্য দুঃখও করিনে। অন্ততঃ আমি তো জানি, আমার এই তো চলার আরম্ভ, আমার সাহিত্যিক জীবনের এই তো সবেমাত্র সেদিন শুরু। আজ-ই আমি আমার পথের দাবী ছাড়ব কেন? ওদের রাজপথে ওরা চলতে যদি না-ই দেয় কাঁটার পথেই চলব সমস্ত মারকে সহ্য ক'রে। অন্ততঃ পথের মাঝ পর্যন্ত তো যাই। আমার বনের রাখাল ভাইরা যে-মালা দিয়ে আমায় সাজালে, সে-মালার অবমাননাই বা করব কেমন করে? ঠিক বলেছ বন্ধু, এবার তপস্যাই করব—পথে চলার তপস্যা।

'বিদ্রোহী'র জয়-তিলক আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে গেল আমার তরুণ বন্ধুদের ভালোবাসায়। একে অনেকেই কলঙ্ক-তিলক বলে ভুল করেছে, কিন্তু আমি করিনি। বেদনা-সুন্দরের গান গেয়েছি বলেই কি আমি সত্য-সুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি? আমি বিদ্রোহ করেছি—বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে,—যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন পচা সেই মিথ্যা-সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়ত আমি সব কথা মোলায়েম ক'রে বলতে পারিনি. তলোয়ার লুকিয়ে তার রূপোর খাপের ঝকমকানিটাকে দেখাইনি—এই তো আমার অপরাধ। এরই জন্যে তো আমি বিদ্রোহী। আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, সমাজের সকল কিছু কুসংস্কারের বিধি-নিষেধের বেড়া অকুতোভয়ে ডিঙিয়ে গেছি, এর দরকার ছিল না মনে ক'রেই।

যাক। আগেই বলেছি, এ কুম্ভকর্ণমার্কা সমাজকে জাগাতে হলে

আঘাত দিয়েই জাগাতে হবে। একদল প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহীর উদ্ভব না হলে এর চেতনা আসবে না। কুম্ভকর্ণের পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বা চিমটি কেটে এর ঘুম ভাঙাবার যে-সব পলিসির উল্লেখ আছে তা' একেবারে মোলায়েম নয়। সেই পলিসিই একবার একটু পরখ ক'রে দেখুকই না ছেলেরা! এতে কি আর এমন হবে! আপনি বলবেন, কুম্ভকর্ণ না-হয় জাগল ভায়া, কিন্তু জেগে সে যে-রকম 'হাঁ'-টা করবে, সে 'হাঁ' তো সঙ্কীর্ণ নয়, তখন! আমি বলি কি, তখন কুম্ভকর্ণ তাদেরই ধরে, জলপানি করবে, যারা তার ঘুম ভাঙাতে গিয়েছিল।

এতই তো মরেছে, না-হয় আরো দু-দশটা মরবে। আপনি বলবেন, ভয় তো ঐখানেই। বন্ধু, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে এগোয় কে? আমি বলি, সে দুঃসাহস যদি আমাদের কারুর না থাকে, তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে সকলে 'আস্‌হাব কাহাফে'র মত রোজ কিয়ামত তক ঘুমোতে পারেন। সমাজকে জাগাবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিন। কারুর পান থেকে এতটুকু চুন খসবে না, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, তেল কুচকুচে নাদুস-নুদুস ভুঁড়িও বাড়াবে এবং সমাজও সাথে সাথে জাগতে থাকবে—এ আসা আলেম সমাজ করতে পারেন, আমরা অবিশ্বাসীর দল করিনে।

আমার কথাগুলো 'মরিয়া হইয়া'র মত শুনাবে, কিন্তু বড় দুঃখে দেখে-শুনে তেতোবিরক্ত হয়ে এসব বলতে হচ্ছে। তাই তো বলি যে, 'বাবা! তোকে রাম মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। মরতে হয় তো এদেরই একজনের হাতে মর, বেশ একটু হাতাহাতি ক'রে, তা'তে সুনাম আছে।—কিন্তু ঐ হনুমানের হাতে মরিস কেন? হনুমানের হাতে মরার চেয়ে বরং কুম্ভকর্ণকে জাগাতে গিয়ে মরা ঢের ভালো।' কথাগুলো যখন বলি তখন লোকে হাততালি দেয়, 'আল্লাহ আকবর' 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিও করে, কিন্তু তারপর আর তাদের খবর পাইনে।

আমিও মানি, গড়ে তুলতে হলে একটা শৃঙ্খলার দরকার। কিন্তু

ভাঙার কোনো শৃঙ্খলা বা সাবধানতার প্রয়োজন আছে মনে করিনে। নূতন ক'রে গড়তে চাই বলেই তো ভাঙি—শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আর ঐ নূতন ক'রে গড়ার আশাতেই তো যত শীঘ্র পারি ভাঙি—আঘাতের পর নির্মম আঘাত হেনে পচা-পুরাতনকে পতিত করি। আমিও জানি, তৈমুর নাদির সংস্কার-প্রয়াসী হয়ে ভাঙতে আসেনি, ওদের কাছে নূতন পুরাতনের ভেদ ছিল না। ওরা ভেঙেছিল সেরেফ ভাঙার জন্যই। কিন্তু বাবর ভেঙেছিল দিল্লী আগ্রা ময়ূরাসন-তাজমহল গড়ে তোলার জন্য। আমার বিদ্রোহও 'যখন চাহে এ মন যা'র বিদ্রোহ নয়, ও আনন্দের অভিব্যক্তি সর্ব-বন্ধন মুক্তের—পূর্ণতম স্রষ্টার।

আপনার 'মুসলিম সাহিত্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই কথা তুলবেন হয়ত। ওর মানে কি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য, না মুসলিম ভাবাপন্ন সাহিত্য? যদি সত্যিকার সাহিত্য হয়, তবে তা সকল জাতিরই হবে। তবে তার বাইরের একটা ধর্ম থাকবে নিশ্চয়। ইসলাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্য রচনা চলতে পারে, কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইসলাম কেন, কোনো ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস করি না। ইসলামের সত্যকার প্রাণ-শক্তি, গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।

ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমি তো স্বীকার করিই, যাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন। ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র ক'রে কাব্য কেন, মহা-কাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমা গান করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে গানের সুর। উঠতে পারেও না। তাহলে তা' কাব্য হবে না। আমার বিশ্বাস, কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের হানি হয়। আপনি কি চান, তা' আমি বুঝতে পারি - কিন্তু সমাজ যা চায়, তা' সৃষ্টি করতে আমি অপারগ। তার কাছে এখনও —

'আল্লা আল্লা বলরে ভাই নবী কর সার
মাজা দুলিয়ে পারিয়ে যাব ভবনদীর পার।'

রীতিমত কাব্য। বুঝবার কোনো কষ্ট হয় না, আল্লা বলতে এবং নবীকে সার করতে উপদেশও দেওয়া হল, মাজাও দুলল এবং ভবনদী পারও হওয়া গেল! যাক বাঁচা গেল!—কিন্তু বাঁচল না কেবল কাব্য। সে বেচারী ভবনদীর এ পারেই রইল পড়ে। ঝগড়ার উৎপত্তি এইখানেই। কাব্যের অমৃত যারা পান করেছে, তারা বলে —মাজা যদি দুলাতেই হয় দাদা, তবে ছন্দ রেখে দুলাও, পারে যদি যেতেই হয়, তবে তরী একেবারে কমল বনের ঘাটে ভিড়াও। অমৃত যারা পান করেনি—আর এরাই শতকরা নিরানব্বুইজন—তারা বলে, কমল বন, টমল বন জানিনে বাবা, সে যদি বাঁশবন হয়, সেওভি আচ্ছা—কিন্তু একেবারে ভবনদীর পার-ঘাটায় লাগাও নৌকা। এ-অবস্থায় কি করব বলতে পারেন? আমি 'হুজ্জতুল ইসলাম' লিখব না সত্যিকার কাব্য লিখব?

'বিদ্রূপ আমি করছিনে, বন্ধু, এ আমার চোখের জল জমানো হাসির শিলাবৃষ্টি।'

সত্যসত্যই আমার লেখা দিয়ে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনা সঞ্চার হয়, তাহলে তার মঙ্গলের জন্য আমি আমার কাব্যেব আদর্শকেও না-হয় খাটো করতে রাজী আছি, কিন্তু আমার এ-ভালোবাসার আঘাতকে এরা সহ্য করবে কিনা সেইটাই বড় প্রশ্ন। হিন্দু লেখকগণ তাঁদের সমাজে গলদ ত্রুটি কুসংস্কার নিয়ে কি-না কশাঘাত করেছেন সমাজকে;—তা সত্ত্বেও তাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা হারান নি। কিন্তু এ হতভাগ্য মুসলমানদের দোষ-ত্রুটির কথা পর্যন্ত বলবার উপায় নেই সংস্কার তো দূরের কথা, তার সংশোধন করতে চাইলেও এরা তার বিকৃত অর্থ ক'রে নিয়ে লেখককে হয়ত ছুরিই মেরে বসবে। আজ হিন্দুজাতি যে এক নবতম বীর্যবান জাতিতে পরিণত হতে চলেছে, তার কারণ তাদের অসমসাহসিক সাহিত্যিকদের তীক্ষ্ণ লেখনী।

আমি জানি যে, বাংলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্ম-জাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজ রুদ্ধ।

হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হ'তে পারে। কিন্তু ইসলামের 'সভ্যতা-শাস্ত্র-ইতিহাস' এ সমস্তকে কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার নয় কি?

আমার মনে হয়, আমাদের নূতন সাহিত্যব্রতী দল এর এক একটা দিক নিয়ে রিসার্চ ও আলোচনার দায়িত্ব নিলে ভালো হয়। আগেই বলেছি, নিশ্চিত জীবনযাত্রায় পূর্ণ শান্তি কোনদিন পাইনি। যদি পাই, সেদিন আপনার এই উপদেশ বা অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা যেন করতে পারি—তা-ই প্রার্থনা করছি আজ।

আবার বলি যাঁরা মনে করেন—আমি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, তাঁরা অনর্থক এ-ভুল করেন। ইসলামের নামে যে কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে—তাকে ইসলাম বলে না-মানা কি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান? এই ভুল যাঁরা করেন, তাঁরা যেন আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়েন দয়া ক'রে—এছাড়া আমার আর কি বলবার থাকতে পারে?

আমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে উঠেন, তাঁরা যে হাফেজ-রুমীকে শ্রদ্ধা করেন—এ-ও আমার মনে হয় না। আমি তো আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাঁদের। এঁরা কি মনে করেন, হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে? তা' হলে মুসলমান-কবি দিয়ে বাংলা-সাহিত্য সৃষ্টি কোনো কালেই সম্ভব হবে না—জৈগুণ বিবির পুঁথি ছাড়া।

বাংলা-সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ও

বাদ দিলে বাংলা ভাষার অর্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরাজী-সাহিত্য হ'তে গ্রীক পুরাণের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাংলা-সাহিত্য, হিন্দু মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুর তেমনি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত-সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ-সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি; বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যহানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা' করেছি।

কিন্তু বন্ধু, এ কর্তব্য কি একা আমারই? আমার শক্তি সম্বন্ধে আপনার যেমন বিশ্বাস, আপনার উপরও আমার সেই একই বিশ্বাস—একই শ্রদ্ধা। আপনিও 'কামাল পাশা' না লিখে এই হতভাগ্য মুসলমানদের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে আরম্ভ করুন না। কেন না আমার মনে হয়, ওদিকে আপনার জুড়ি নেই, অন্ততঃ আমাদের মধ্যে কেউ। 'কামাল পাশা'র দরকার আছে জানি, কিন্তু তার চেয়েও দরকার—আমাদের চোখের সামনে আমাদেরই জীবনের এই ট্রাজেডি তুলে ধরা। কবিতা ও প্রবন্ধ-লেখকের আমাদের অভাব নেই। নাটক-লিখিয়ের অভাবও আপনাকে দিয়ে পূরণ হতে পারে। আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব—কথা-সাহিত্যিকের। এর তো কোনো আশা-ভরসাও দেখছিনে কারুর মধ্যে। অথচ কথা-সাহিত্য ছাড়া শুধু কাব্যের মধ্যে আমাদের জীবন, আমাদের আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে কেউ পারবেন না। অনুবাদের দিক দিয়েও আমরা সবচেয়ে পিছনে। সঙ্গীত, চিত্রকলা, অভিনয় ইত্যাদি ফাইন আর্টের কথা না-ই বললাম।

এত অভাবের কোন্ অভাব পূর্ণ করব আমি একা, বন্ধু। অবশ্য

একাই হাত দিয়েছি অনেকগুলি কাজেই—তাতে করে হয়ত কোনোটাই ভালো ক'রে হচ্ছে না।

জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান, বেদনার গান গেয়ে যাব আমি, দিয়ে যাব আমি নিজেকে নিঃশেষ ক'রে সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা।

আপনার এত সুন্দর, এমন সুলিখিত চিঠির কি বিশ্রী করেই না উত্তর দিলাম। ব্যথা যদি দিয়ে থাকি, আমার গুছিয়ে বলতে না পারার দরুন, তাহলে আমি ক্ষমা না চাইলেও আপনি ক্ষমা করবেন —এ বিশ্বাস আমার আছে।

আপনার বিরাট আশা, 'ক্ষুদ্র আমার মাঝে পূর্ণ যদি না-ই হয়, তবে তা' আমাদেরই কারুর মাঝে পূর্ণত্ব লাভ করুক, আমি কায়মনে এই প্রার্থনা করি।"

গিরিবালা দেবী ও প্রমীলা নজরুল ইসলাম

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

…আমার এই স্মৃতি-কথায় গিরিবালা দেবী ও প্রমীলার কথা আমি বারে বারে বলেছি। তবুও তাঁদের সম্বন্ধে আমার বলা এখনো শেষ হয়নি।

আমি আগেই বলেছি যে, শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী তাঁর স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন এবং এক মাত্র সন্তান প্রমীলা জন্মাবার পরেই তিনি বিধবা হয়েছিলেন। তাঁর স্বামী তাঁর প্রথমা স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থাতেই তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। আশ্চর্য নয় যে, এই প্রথমা স্ত্রী এখনো বেঁচে থাকতে পারেন। ১৯৬৪ সালের শেষার্ধে আমি তাঁর বেঁচে থাকার কথা শুনেছিলাম বলে মনে পড়ে।

নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক বন্ধুরা কতটা কি জানতেন তা জানিনে, গিরিবালা দেবী সাহিত্যে অনুরাগিণী ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের পড়া-শুনা করতেন এবং বাংলা ভাষা ভালোই জানেতন। যাঁরা শুধু পড়েই আনন্দ পান, কোন কিছু লিখে নিজেদের জাহির করেন না (সমাজে অবশ্য তাঁদের সংখ্যাই বেশী), গিরিবালা দেবী ছিলেন তাঁদেরই একজন। আমাদের চারপাশে নানান রকমের সমস্যা আমাদের ঘিরে রেখেছে। অন্য কিছু না হোক, কমপক্ষে এই সকল সমস্যার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে ইচ্ছা করলেই তিনি একজন লেখিকা হিসাবে নাম করতে পারতেন।* নজরুলের পরিচয়ের সুযোগেও মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা তার জন্যে অবারিত হতে পারত। কিন্তু তিনি ভিন্ন মেজাজের মেয়ে ছিলেন। নজরুলের

* পরে শুনেছি গিরিবালা দেবীর কিছু কিছু লেখা কাগজে ছাপা হয়েছিল।

সব লেখার খবর তিনি রাখতেন। সে নিজেও তার লেখার খবর তাঁকে জানাত। কারণ, সমঝদার লোককে নিজেদের লেখার খবর জানিয়ে লেখকরা আনন্দ পান। নজরুল কয়েকদিন বাইরে থেকে বাড়ী ফিরলে সেই ক'দিনে কি লিখেছে তার খবর গিরিবালা দেবী নিতেন। বাধ্য হয়ে আমাকে একসঙ্গে অনেক বছর কলকাতা হতে অনুপস্থিত থাকতে হয়েছিল। কলকাতায় ফিরে আসার পরে তিনি আমাকে নজরুলের লেখার বিস্তৃত বিবরণ জানিয়েছিলেন। তাঁর মুখেই খবর পেয়েছিলাম যে, নজরুলের গীতি-নাট্য 'আলেয়া'র গানগুলি প্রথমে একবার চুরি হয়ে গিয়েছিল। তারপরে আবার নজরুলকে নূতন করে গানগুলি লিখতে হয়েছে। তিনিই আমায় জানিয়েছিলেন যে, অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র অনুরোধে নজরুল প্রথম শ্যামা বিষয়ক গান রচনা করেছিল। গিরিবালা দেবীই আমায় বলেছিলেন যে, চৌরঙ্গি ছায়াচিত্রের জন্য নজরুল বড় বেশী পরিশ্রম করেছিল। কিন্তু ফজলি ব্রাদার্স পুরো টাকা নজরুলকে দেন নি। নজরুলের অসুখ হওয়ার পরে গিরিবালা দেবীর মুখেই আমি প্রথম শুনতে পাই যে হাইকোর্টের সলিসিটর শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তের নিকট মাত্র চার হাজার টাকার জন্যে নজরুলের গানের রয়াল্‌টি ও পুস্তকাদি বাঁধা পড়েছে।

এই মহীয়সী মহিলা সমাজের সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে তাঁর একমাত্র সন্তান প্রমীলার হাত ধরে একদিন দেবরের সংসার হতে বা'র হয়ে এসে ছন্নছাড়া নজরুল ইসলামের সংসার গড়ে তুলেছিলেন। নজরুলের কাব্য ও দেশপ্রেম তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। নজরুল যে মুসলমানের ছেলে একথা তিনি কোনদিন মনের কোণেও স্থান দেন নি। নানান দিকের নানান লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন।

গিরিবালা দেবীকে আমি প্রথম দেখেছিলাম ১৯২১ সালে কুমিল্লায়। তারপর তাঁর সঙ্গে আমায় দেখা হয় আমার প্রথমবারের

জেল হতে ফিরে অসার পরে ১৯২৬ সালে। কৃষ্ণনগরে নজরুল ইসলামের বাড়িতেই এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন থেকে প্রায়ই তাঁদের মা ও মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। সেই যুগে আবত্নল হালীম আর আমি একসঙ্গে থেকেছি। আমরা ভাবতাম তাঁদের মা ও মেয়ের অস্নবিধাগুলির প্রতি আমাদের নজর রাখা উচিত। শুধু ভাবাই সার। আসলে আমাদের কোন কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। সব সময়ে আমাদেরই খাওয়া জুটত না। গিরিবালা দেবী সবই বুঝতেন। কোন কোন সময়ে নজরুলের কোন বন্ধুর তরফ হতে তাঁদের কোনো অস্নবিধা ঘটলে গিরিবালা দেবী আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমারা গিয়েছি, আবত্নল হালীমই গিয়েছে বেশীর ভাগ সময়ে, কিন্তু কতটুকু কি আমাদের করার ক্ষমতা ছিল ?

গিরীবালা দেবী একটা কিছু করতে চাইতেন। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক স্কুলের দ্বিতীয়া শিক্ষয়ত্রীর একটা কাজের তদবীর করার কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। এই কাজের যোগ্যতা তাঁর ছিল। তাঁর চেয়ে অনেক কম লেখাপড়া জানা মেয়েকে আমি এই কাজ করতে দেখেছি। একবার আমি তাঁর এই কাজের জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করার কথাও ভেবেছিলাম কিন্তু নজরুল ইসলাম রাজী হলো না কিছুতেই। গিরিবালা দেবীর রাজনীতিতে আকর্ষণ ছিল। আমরা ইচ্ছা করলেই আমাদের রাজনীতিতে তাঁকে টানতে পারতেম। কিছু কিছু কাজ আমরা তাঁকে দিচ্ছিলেমও। এমন সময়ে আমাদের গিরেফ্‌তারের ফলে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। তখনও ধার্মিক কৃচ্ছ্রতা তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় নি।

নজরুলের ছেলে বুলবুল ১৯২৬ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখে কৃষ্ণনগর 'গ্রেস কটেজে' জন্মেছিল। 'গ্রেস কটেজ' ছিল খ্রীস্টান মহিলার বাড়িটির নাম, যে-বাড়ীতে নজরুল থাকত। নজরুল ছেলের নাম রেখেছিল অরিন্দম খালিদ। বুলবুল তার ডাক নাম।

এই নামেই শিশুটি শুধু যে নজরুলের বন্ধুদের নিকট পরিচিত হয়েছিল তা নয়, সে তাঁদের ওপরে তার অপরিসীম প্রভাবও বিস্তার করেছিল। একটি খুদে যাদুকর ছিল সে। নজরুলের বন্ধুদের সঙ্গে সে চলে যেত এবং তাঁদের বাড়ীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আবার নিজেদের বাড়ীতে সে ফিরে আসত। অদ্ভুত ছিল তার স্মৃতিশক্তি। একখানা ইংরাজী পাখীর পুস্তক নজরুল কিংবা আর কেউ তাকে দিয়েছিল। সেই পুস্তকে বিরাট সংখ্যক পাখীর ছবি মুদ্রিত ছিল এবং প্রত্যেক ছবির নীচে ইংরাজী ভাষায় পাখীর নাম লেখা। নজরুল শুধু পাখীদের ইংরাজী নামগুলি তাকে পড়ে শুনিয়ে দিয়েছিল, হয়তো একটি পাখীর নাম একাধিকবাব শুনিয়েছিল। তাতেই তার নামগুলি মুখস্থ হয়ে যায়। কেউ বই খুলে তাকে ছবি দেখালেই সে পাখীর ইংরাজী নাম বলে দিত। আমি যখনকার কথা বলছি তখন আড়াই বছরের মতো তার বয়স ছিল। অক্ষর পরিচয় তার তখনও হওয়ার কথা নয়।

এই বুলবুল মা ও দিদিমার চোখের মণি ছিল,—চোখের মণি ছিল সে নজরুলের তামাম বন্ধুদের, যাঁরা তার বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন। কিন্তু কেউ জানত না কত গভীর ছিল নজরুলের স্নেহ তার প্রতি। আমি নিজে সর্বদা শিশুদের নিকট হতে শত-হস্ত দূরে থেকেছি। তাদের আকর্ষণের নিকটে কখনও আমি ধরা দিতে চাই নি। নজরুলের পানবাগান লেনের বাড়ীতে গিয়ে বিদায় নিয়ে ফিরে আসার সময়ে বুলবুলও সঙ্গে সঙ্গে দোতলা হতে নেমে আসত। গেটে এসে বলত, "জ্যেঠামশায়, আবার এসো।"

মীরাট জেলে গিয়ে বুঝেছিলেম নজরুলের বুলবুল আমার ওপরেও কিঞ্চিৎ যাদু বিস্তার করেছে।

১৯৩০ সালে একদিন মীরাট জেলেই আবদুল হালীমের ছোট ভাই কাসিমের নিকট হতে (আবদুল হালিম তখন গাড়োয়ান ধর্মঘটের সংস্রবে জেলে সাজা খাটছিল) একখানা পত্র পেলাম যে, নজরুলের বুলবুল আর নেই! দুরন্ত বসন্ত রোগে সে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২৪শে

বৈশাখ তারিখে (খ্রীষ্টীয় হিসাবে ১৯৩০ সালের ৭ই কিংবা ৮ই মে) মারা গেছে। আমার মনের তখন যে-অবস্থা হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার তখন মনে হচ্ছিল যে আমি যদি কাঁদতে পারতাম তবে ভালো হতো। কিন্তু তখনই মনে হলো, বন্ধু-পুত্রের মৃত্যুতে আমার শোকোচ্ছ্বাসের মর্যাদা হয়তো আমার সহ-বন্দীরা দেবেন না এবং সেটা হবে বুলবুলের স্মৃতির অবমাননা। কাজেই আমি নিজের ভিতরে নিজে গুমরাতে লাগলাম। এই সময়েই আমি মাসী-মাকে (গিরিবালা দেবীকে নজরুল প্রথম পরিচয় হতেই মসী-মা ডাকত, সেইজন্যে তার বন্ধুরাও তাঁকে মাসী-মা ডাকতেন) একখানা দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেম। আমার এই পত্রখানার কথাই কবি জসীমউদ্দিন তাঁর 'ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায়' নামক পুস্তকের ১৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

বুলবুলের মৃত্যুতে নজরুল, প্রমীলা ও গিরিবালা দেবী প্রত্যেকেই প্রাণে দুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন, অথচ তাঁদের প্রত্যেকেই প্রত্যেককে শোকের আঘাত হতে বাঁচাতে চাইছিলেন। তার মানে তাঁরা আপন আপন মনে গুমরে মরছিলেন। পরে গিরিবালা দেবীর সঙ্গে আমার যখন দেখা হয়েছিল তখন তিনি আমায় বলেছিলেন যে, বুলবুলের মৃত্যু তাঁর মন ভেঙে দিয়েছে। তিনি কোথাও চলে যেতে চান, কিন্তু তাঁকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। বললেন, "মাঝে মাঝে বাক্স হতে তোমার পত্রখানা বা'র ক'রে আমি পড়ি আর কাঁদি।" তিনিই আমায় বলেছিলেন, অসুখের সময় বুলবুল তার বাবাকে কিছুতেই কাছছাড়া হতে দেয় নি। তার চোখেও বসন্তের গুটি বা'র হয়েছিল, বেঁচে থাকলে বুলবুল অন্ধ হতো। আমি এক এক সময় ভাবি, অন্ধ হয়েও বুলবুল যদি বেঁচে থাকত। একজন বড় গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ তো সে হতে পারত। নজরুল আমায় একদিন বলেছিল যে, উস্তাদ জমীরুদ্দীন খানের সঙ্গে যখন তার সঙ্গীতের চর্চা হতো তখন শুনে শুনে বুলবুল তার সব কিছু আয়ত্ত করে ফেলত। এমন ছিল তার

স্মৃতিশক্তি। বুলবুলের মৃত্যুর পরেই সকলে বুঝছিলেন যে, কত গভীর ছিল পুত্রের প্রতি নজরুলের স্নেহ ও ভালবাসা।

গিরিবালা দেবীর ধার্মিক কৃচ্ছ্রসাধন কখন হতে শুরু হয়েছিল তা আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না, আমার মনে হয় বুলবুলের মৃত্যুর পর হতেই তাঁর এই কৃচ্ছ্রতা বেড়ে গিয়ে থাকবে। তিনি কঠোরভাবে একাদশীর উপবাস করতেন, গঙ্গাস্নান করতে যেতেন ইত্যাদি। এই গঙ্গাস্নানের জন্যই তিনি উত্তর কলকাতা ছাড়তে চাইতেন না। হিন্দু-বিধবার জীবনে এই রকম কঠোরতা এসেই থাকে। তিনি যদি রাজনীতির কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারতেন তবে অন্য কথা ছিল। কিন্তু ধার্মিক কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও গিরীবালা দেবীকে আমি কখনও অনুদার হতে দেখিনি। নজরুলের বন্ধুদের তিনি সেবা-যত্ন করেছেন। দারিদ্র্যের সংসারে তিনি দারিদ্র্যকে ভূষণ ক'রে নিয়েছেন।

আবদুল হালীমের একখানা পত্র আমি এই পুস্তকে ছেপেছি। হুগলীতে নজরুলের যে অসুখ হয়েছিল এবং সে অসুখে তার বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না, তাতে গিরিবালা দেবী কত সেবা করেছিলেন তা এই পত্রে আছে। হুগলীতে নজরুল বেঁচে উঠেছিল বটে, কিন্তু তার অসুখের জের কৃষ্ণনগরেও চলেছিল। সে সময়ে গিরিবালা দেবী নজরুলের অশেষ যত্ন নিয়েছিলেন। তারপরে, ১৯৪২ সালে নজরুলের বর্তমান অসুখ যেদিন শুরু হয়েছিল সেদিন থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কী যে তিনি করেছেন নজরুলের জন্য সেটা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই শুধু বুঝতে পারবেন। যাঁরা দূরে দূরে থেকেছেন তাঁদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। শুধু কি নজরুলের সেবা করতে হয়েছে তাঁকে,—তাঁর নিজের মেয়ে প্রমীলা, সেও তো ছিল শয্যাশায়িনী। নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গিয়েছিল তার। একই সঙ্গে মেয়ের সেবাও করতে হয়েছে তাঁকে। আবার নাতি দু'টিকেও মানুষ করতে হয়েছে, পড়াতে হয়েছে। এরই মধ্যে হয়তো পরিচিতাদের নিকটে টাকা ধার করতেও যেতে হয়েছে তাঁর।

এটা সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে, নজরুল ইসলামের বিরাট সংখ্যক বন্ধুদের ভিতরে খুব বেশীর ভাগই গিরিবালা দেবীর বিরুদ্ধে কোনো দুর্নাম রটনা করেন নি। খুব বেশীর ভাগই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকেরা যা রটিয়েছে তা মর্মান্তিক। উনিশশো ত্রিশের দশকে নজরুলের হাতে বিস্তর টাকা এসেছে। আবার এই উনিশশো ত্রিশের দশকেই (১৯৩৯ সালে) নজরুল তার সব কিছু বন্ধক রেখেছিল শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তের নিকটে মাত্র চার হাজার টাকা ধার নিয়ে। গিরিবালা দেবী ও প্রমীলার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ ছিল এই যে, এত তো টাকা এলো গেলো, তাঁরা তার ভিতর থেকে কিছু টাকা জমালেন না কেন ? সব জায়গায় এটাই তো দেখা যায় যে, সংসারে মেয়েরা কিছু কিছু টাকা জমিয়ে রাখেন। অভিযোগকারীদের কথা এই যে, তাঁরা যদি কিছু টাকা জমিয়ে রাখতেন তবে নজরুলের অসুখের প্রথম ধাক্কাটা সামলানো যেত। কিন্তু এটা তাঁরা বুঝতে পারলেন না যে, নজরুলের অসুখের শুরুতে তার পরিবারে জমানো টাকা থাকা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এটা সত্য কথা যে, উনিশশো ত্রিশের দশকে নজরুলের হাতে হাজার হাজার টাকা এসেছিল। সে সব টাকা কি সে শুধু তার স্ত্রী ও শাশুড়ীর হাতে তুলে দিয়েছিল ? আধ্যাত্মিক ব্যাপারের পেছনে ও বন্ধুদের জন্য টাকা খরচ করেনি সে ? তবুও না হয় জবরদস্তি ধরে নিলাম যে, প্রমীলা ও গিরিবালা দেবী হাজার দু'হাজার টাকা জমা করে রাখতে পারতেন। কিন্তু ১৯৩৯ সালে প্রমীলার অসুখের সময়ে কি হতো ? তখনই তো সে টাকা খরচ হয়ে যেত। প্রমীলার অসুখের সময় হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তার জন্যই তো শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তের নিকটে নজরুলের যথাসর্বস্ব বাঁধা পড়ল। গানের রয়ালটি পর্যন্ত বাদ গেল না। নজরুলের এই অদ্ভুত ধরনের বন্ধুদের মুখের ভিতরে জিহ্বা ছিল, যেমন খুশি কথা তাঁরা বলতে পারতেন কিন্তু কত কী যে ঘটে গেল তার কিছুই তাঁরা চোখে দেখতে

পেলেন না। মানুষের বিপদের সময়ে কথা শোনানো বাহাদুরীর কাজ নয়। আমি এখানে কবি জসীমউদ্দীনের লেখা 'ঠাকুর-বাড়ীর আঙিনায়' হতে কিছুটা তুলে দিচ্ছি। জসীম শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীকে 'খালা-আম্মা' অর্থাৎ মাসী-মা ডাকতেন।

"একদিন বেলা একটার সময় কবিগৃহে গমন করিয়া দেখি খালা-আম্মা বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার মুখ আজ বেজার কেন'?"

"খালা-আম্মা বলিলেন, 'জসীম, সব লোকে আমার নিন্দা করে বেড়াচ্ছে। নূরুর নামে যেখান থেকে যত টাকা-পয়সা আসে, আমি নাকি সব বাক্সে বন্ধ করে রাখি। নূরুকে ভালমত খাওয়াই না, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি না। তুমি জান আমার ছেলে নেই, নূরুকেই আমি ছেলে করে নিয়েছি। আর আমিই বা কে! নূরুর দু'টি ছেলে আছে—তারা বড় হয়ে উঠেছে। আমি যদি নূরুর টাকা লুকিয়ে রাখি, তারা তা সহ্য করবে কেন? তাদের বাপ খেতে পেল কিনা, তারা কি চোখে দেখে না? নিজের ছেলের চাইতে কি কবির প্রতি অপরের দরদ বেশী? আমি তোকে বলে দিলাম জসীম, এই সংসার থেকে একদিন আমি কোথাও চলে যাব। এই নিন্দা আমি সহ্য করতে পারিনে'।"

"এই বলিয়া খালা-আম্মা কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, 'খালা-আম্মা, কাঁদবেন না, একদিন সত্য উদ্ঘাটিত হবেই'।"

"খালা-আম্মা আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন, যে ঘরে নজরুল থাকিতেন সেই ঘরে। দেখিলাম, পায়খানা করিয়া কাপড়-জামা সমস্ত অপরিষ্কার করিয়া কবি বসিয়া আছেন। খালা-আম্মা বলিলেন, 'এইসব পরিষ্কার করে স্নান করে আমি হিন্দু বিধবা তবে রান্না করতে বসব। খেতে খেতে বেলা পাঁচটা বাজবে। রোজ এইভাবে তিন-চারবার পরিষ্কার করতে হয়। যারা নিন্দা করে তাদের বোলো, তারা এসে যেন এই কাজের ভার নেয়। তখন যেখানে চক্ষু যায় আমি চলে যাব'।" (১৭১-৭২ পৃষ্ঠা)।

আমি এখানে জসীমউদ্দীনের লেখা হতে তুলে দিলাম এইজন্য যে, এই লেখায় এতটুকুও অতিরঞ্জন নেই। এই জাতীয় রচনা নজরুলের বন্ধুমহল হতেই হয়েছে। তার কথা বলার শক্তি লোপ পাওয়ার পর কেউ কেউ আবার তার নাম নিয়েই রটনা করেছে। আমার নিকটে নজরুলের নাম নিয়ে যখনই কেউ বলতেন যে, কি কি বিরূপ মন্তব্য তাঁর নিকটে নজরুল মাসী-মার সম্বন্ধে করেছে তখন আমি বুঝে নিতাম যে, তিনি নিজের মন্তব্যই বলছেন। সুখের বিষয় যে এঁদের সংখ্যা বেশী ছিল না। তবুও আমি ভাবি, এই মহীয়সী মহিলা নজরুলের জন্য কি করলেন, আর প্রতিদানে তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে কি পেলেন তিনি!

গিরিবালা দেবী কাউকে কিছু না বলে একদিন সত্য সত্যই চলে গেলেন। কাউকে মানে আমাদের। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখে কলকাতার বিখ্যাত হিন্দু-মুস্‌লিম দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। কয়েকদিন পরে দাঙ্গা থেমে যায়। তারপর আবার দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। এই দ্বিতীয় দাঙ্গা শেষ হওয়ার পরে যখন একটা থমথমে ভাব চলেছিল তখনই চলে গিয়েছিলেন শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী। সম্ভবত সেটা অক্টোবর মাস ছিল। নজরুলরা তখনও শ্যামবাজার স্ট্রিটের বাড়ীতে রয়েছে। আমি একদিন তাদের দেখতে গেলাম। কিন্তু গাড়ী যোগাড় ক'রে গেলাম এবং হিন্দু নামধারী একজন কমরেডকে গাড়ীর চালক ক'রে তবে গেলাম। বাড়ীর দরওয়াজায় নজরুলের নামের যে ফলক লাগানো ছিল তা দাঙ্গার সময় খুলে ফেলতে হয়েছিল। বড় রাস্তা হতে বাড়ীটি সামান্য ভিতরের দিকে ছিল। তাই বড় রাস্তায় গাড়ী রেখে আমি একাই ওদের বাড়ীতে গেলাম। প্রমীলার অসুখ হওয়ার পর হতে খবর দিয়ে নীচে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে তবে আমি উপরে যেতাম। কারণ, আমাকে প্রমীলার ঘরেই বসানো হত। তার মানে ঘরটি গোছানোর পরে আমায় ডাকা হতো। সিঁড়ির গোড়া হতে মাসী-মা নিজেই আমায় ডেকে

নিতেন। ও-বাড়ীতে সকলে জুতো খুলে ওপরে যেতেন। আমি 'শু' পরি বলে মাসী-মা বলতেন, "না বাবা, তোমায় জুতো খুলতে হবে না।" সেদিন সকাল বেলাতেই গিয়েছিলেম। মাসী-মা আমায় ডেকে নিলেন না। প্রমীলার ঘরে তার সঙ্গে কথাবার্তা বললাম, তখনও মাসী-মাকে দেখলাম না। আমি ধ'রে নিলাম যে তিনি গঙ্গাস্নান করতে গেছেন। তারপরে নজরুলকে একবার দেখে, আমি যখন ফিরে আসছিলাম তখন সব্যসাচীও (তার বয়স তখন আঠারো বছরের মতো) আমার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত এলো এবং বলল, "দিদিমা পরশু দিন রাগ ক'রে চলে গেছেন।" তখনই আমি বুঝলাম যা আশঙ্কা করেছিলাম তা সত্যে পরিণত হয়েছে। বড় মনোকষ্ট পেয়ে গিরিবালা দেবী চলে গিয়েছেন। প্রমীলা ধরে নিয়েছিল যে তার মা প্রথমে সমস্তিপুরে ভাইদের বাড়ীতে যাবেন, তারপরে যাবেন কাশীতে। আমি সব্যসাচীকে বললাম, "তোমরা চারদিকে চিঠি-পত্র লিখে খবর নাও। মাসী-মা যেখানেই যান না কেন, আমি নিজে গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনব।" কিন্তু তাঁর ভাইদের বাড়ী থেকে খবর এলো যে সেখানে তিনি যান নি! কোথাও রাস্তা হতে একখানা ছোট্ট পত্র প্রমীলাকে শুধু তিনি লিখেছিলেন যে তাঁর জন্য সে যেন কোনো চিন্তা না করে। এখানেই সব শেষ হয়ে গেল। আর কোনো খবর পাওয়া গেল না তাঁর। একবার শুধু প্রমীলাদের কে একজন পবিচিত লোক এসে বলেছিলেন যে তাঁর মনে হলো তিনি যেন অনেক দূর হতে কাশীতে গিরিবালা দেবীকে দেখেছিলেন। গিরিবালা দেবী (সত্যই তিনি যদি গিরিবালা দেবী হোন) একটি গলিতে ঢুকে গেলেন। সেই ভদ্রলোক আর কিছুতেই তাঁর পাত্তা করতে পারলেন না। জানিনে এই অনিশ্চিত খবরকে গিরিবালা দেবীর শেষ খবর বলা যায় কিনা। বেঁচে থাকলে এখন তাঁর বয়স বাহাত্তর তিয়াত্তর বছর হবে। কিন্তু বেঁচে কি তিনি আছেন? আজও তিনি যদি বেঁচে থাকেন তবে তিনি কি খবর পেয়েছেন যে তাঁর একমাত্র সন্তান প্রমীলা আর নেই?

পেন্সনের কাগজে এবং আরও অনেক কিছুতে প্রমীলাকে নাম সই করতে হতো। সে সই করত—প্রমীলা নজরুল ইসলাম। কাজী নজরুল ইসলামের স্ত্রী হয়ে সে নিজেকে ধন্য মনে করেছিল। ১৯২১ সালে তাকে যখন আমি প্রথম কুমিল্লায় দেখেছিলেম তখন চঞ্চলা হলেও বড় প্রাণময়ী মেয়ে ছিল সে। ১৯২৬ সালে তাকে যখন আমি আবার দেখলাম, অর্থাৎ নজরুলের স্ত্রীরূপে দেখলাম তখন মনে হলো যে সে তার বয়সের পক্ষে একটু বেশী ধীর, স্থির ও গম্ভীর। তার বয়স তখন ছিল মাত্র আঠারো বছর। সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমার সঙ্গে বন্ধু-পত্নীর পরিবর্তে সম্পর্কটা ছোট বোনের ক'রে নিল।

পরে পরে প্রমীলা কয়েকটি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। পুত্র বুলবুলের মৃত্যুতে সে পেল প্রচণ্ড আঘাত। দ্বিতীয় আঘাতটি এলো তার নিজের শরীরের ওপরে ১৯৩৯ সালে। মাস মনে করতে পারছিনে। তার বাঁচার আশা একেবারেই ছিল না। শেষ পর্যন্ত তার নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে সে জীবনে বেঁচে গেল। তারপরে বছরের পর বছর তাকে বিছানায় শুয়েই থাকতে হয়েছে। জীবনে আর কখনও সে উঠে বসতে পারেনি। নজরুল পাগল হয়ে যাওয়ায় সে পেয়েছিল তৃতীয় প্রচণ্ড আঘাত। চতুর্থ আঘাত সে পেয়েছিল ১৯৪৬ সালে যখন গিরিবালা দেবী সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বিবাগী হয়ে চলে গেলেন। এর কোনো আঘাতেরই বেদনা পরিমাপ করা যায় না। জন্মের পর হতে সে কোনো দিন মা'কে ছেড়ে থাকেনি। মা'র ছত্রচ্ছায়াতেই তার জীবনের বছরগুলি একের পর এক কেটে গিয়েছিল। সেই মা যে এমনভাবে চলে গেলেন তার বেদনা কত গভীরভাবে প্রমীলার বুকে বেজেছিল তা আমাদের পক্ষে অনুমান করাও কঠিন। শুধু কি এই অপরিমেয় বেদনাই? সঙ্গে সঙ্গে নজরুল আর প্রমীলা অকূল সাগরেও ভাসল। গিরিবালা দেবীই তো নজরুলের সব সেবা করতেন। উত্থানশক্তিহীনা প্রমীলাও তো একান্ত-ভাবে মায়ের ওপরেই নির্ভরশীলা ছিল। আমরা বরাবর প্রমীলাকে

গিরিবালা দেবীর ছত্রচ্ছায়ায় দেখেছি। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ আগে কোনো দিন আমাদের ঘটেনি। এইবার সকলে সেই সুযোগ পেলেন। শোক-জর্জরিতা প্রমীলার ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে এবার সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে নজরুলকে সামলালো এবং নিজেরও ব্যবস্থা করে নিলো। লোক বেশী লাগল, কাজেই টাকাও বেশী খরচ হলো। কিন্তু ব্যবস্থা সে ক'রে ফেলল। পুরো সংসারটা সে শুয়ে শুয়েই চালাতে লাগল। বাজার করানো, রান্নাবান্না, সকলকে খাওয়ানো-দাওয়ানো এই সব কিছুই চললো তারই তদারকে। তার নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু উর্ধ্বাঙ্গ ছিল সবল। কাৎ হয়ে সে রান্নাঘরের তরকারি কুটে দিত, এমন কি মাছও কুটে দিত সে। কেউ গেলে যদি তার ইচ্ছা হতো, যে তাকে সে নিজের হাতে চা তৈরী ক'রে খাওয়াবে, রান্নাঘর হতে গরম জল আনিয়ে তাও সে করত। টাকা-কড়ির হিসাব-কিতাব সবই রাখত সে। ছেলেরা তো বাড়ী থাকত না প্রায়ই। কবিকে দেখতে কত-কত লোক আসতেন, সে-সব ব্যবস্থাও প্রমীলা করত।

প্রমীলার কাছে আমি বুলবুলের কথা কখনও তুলতাম না। একবার শুধু কথায় কথায় বলেছিলেম যে ওদের ছেলে অনিরুদ্ধ দেখতে, কতকটা বুলবুলের মতো হয়েছে। গিরিবালা দেবীর কোনো খবর কেউ দিলেন কিনা তা হয়তো কোন কোন দিন জিজ্ঞাসা করতাম। সব দুঃখ-দুর্ভাগ্য সে মুখ বুজে সহ্য করে যেত। কী সহনশীলতা যে তার ছিল তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়! ১৯৫১ সালে তিন বছরের কিছু বেশী দিন পরে জেল হতে বের হয়ে যখন ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম তখন শুধু নজরুলকে দেখিয়ে একদিন সে বলেছিল যে, "দেখুন দাদা, কি মানুষ কি হয়ে গেছেন।"

বাইরে থেকে প্রমীলার স্বাস্থ্য ভালোই দেখাত। প্রকৃত বয়সের চেয়ে তার বয়সও অনেক কম দেখাত। মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে মৃত্যু

যে তাকে কেড়ে নেবে একথা আমরা কখনও ভাবতে পারিনি। আমার মনে হয় প্রমীলা নিজেও ভাবেনি যে এত তাড়াতাড়ি সে মরবে। কিন্তু রোগ তাকে আক্রমণ করেছিল। ভিড় হয় বলে নজরুলের জন্মদিনে আমি তাদের বাড়ী যেতাম না, একদিন আগে কিংবা একদিন পরে যেতাম। ১৯৬২ সালে আমি কিন্তু নজরুলের জন্মদিনেই ওদের বাড়ী গিয়েছিলেম। প্রমীলার কাছে যেতেই সে বলল, "দাদা, একটু পায়ের ধুলো দিন। কাল আমি মরে গিয়েছিলেম, আর তো দেখা হতো না।" শুনলাম আগের দিন সে দীর্ঘক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিল। পুরো জুন মাস বাড়াবাড়ি অসুখ চললো। এর মধ্যে আর একদিন আমি ওদের বাড়ীতে যাই, অল্পক্ষণ পরেই সেদিন সে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি অন্য ঘরে কিছুক্ষণ বসে তারপরে বাড়ী চলে এসেছিলেম। ঘুম থেকে উঠেই সে বৌমাকে (অনিরুদ্ধের স্ত্রীকে) আমায় ডেকে দিতে বলে। বৌমা তখন তাকে জানাল যে "মা, আপনি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তখন তিনি চলে গিয়েছেন। বৌমা যদি এই কথাটা টেলিফোনে আমায় সেই দিনই জানিয়ে দিত তবে আমি সেই দিনই কষ্ট করে আবার যেতাম। তেতলায় উঠতে আমার খুব কষ্ট হয় বলে সে আমাকে সেদিন আর খবরটি দেয় নি। পরে সে যখন আমায় খবরটি জানাল তখন কথা বলার মতো সুস্থ আর আমি প্রমীলাকে পাই নি। কী যে সে আমায় বলতে চেয়েছিল,—নজরুলের কথা না ছেলেদের কথা কে জানে?

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে প্রমীলা মারা যায়। সে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২৭শে বৈশাখ তারিখে (খ্রীষ্টীয় হিসাবে ১৯০৮ সালের মে মাসে হবে) জন্মেছিল। আমি আমার মা-বাবার কনিষ্ঠ সন্তান। আমাকে 'দাদা' ডাকার কেউ ছিল না। একমাত্র প্রমীলাই আমায় 'দাদা' ডাকত! তার মৃত্যুতে আমায় 'দাদা' ডাকার আর কেউ রইল না।

প্রমীলার মারা যাওয়ার দু'তিন দিন পূর্বে সব্যসাচী আমায়

জিজ্ঞাসা করল, "জেঠা মশায়, মা'র অবস্থা তো খুবই খারাপ। তিনি যদি মারা যান তাঁর অন্ত্যেষ্টি কিভাবে হবে? আমি বললাম, "কেন, তোমার মা তো কখনো ধর্মান্তর গ্রহণ করেনি। তাকে তোমরা দাহ করবে। তবে আমার নিজের মত তাকে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে দাহ করা।"

একটি হিন্দু ছেলে প্রমীলার কাছে থাকত। তার কাজ-কর্ম করে দিত। প্রমীলার মৃত্যুর আগের দিন সেই ছেলেটি সবাইকে এবং ৬৪।এ, আচার্য জগদীশ বসু রোডে আমাদের পার্টি অফিসে এসে আমাকে বলল যে, প্রমীলাকে যেন কবর দেওয়া হয় এই ইচ্ছা তার নিকটে তিনি প্রকাশ করেছেন। কবি প্রমীলার ঘরেই থাকত সেই ছেলেটি, রাত্রে কবি কি করেন, না করেন, তার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য প্রমীলাদের দুয়ারের বাইরে করিডরে শুতো। একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে তার সঙ্গে প্রমিলার অনেক সব কথা হচ্ছিল। সেই সময়ে প্রমীলা তাকে বলে দেয় যে তার মৃত্যুর পর নজরুলের পাশেই যেন তাকে কবর দেওয়া হয়। প্রমীলা বয়সে নজরুলের চেয়ে নয় দশ বছরের ছোট ছিল। সে হয়তো মনে করেছিল যে নজরুলের পরেই তার মৃত্যু হবে। প্রমীলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার ছিল না। অন্য কোন লোকও কিছু বলেনি। তখন নজরুলের ভাই-পোরা ধ'রে বসল যে তাদের কাকীমাকে তারা চুরুলিয়া গ্রামে নিয়ে গিয়ে কবর দেবে। তার মানে মৃত্যুর পরে নজরুলেরও কবর হবে চুরুলিয়ায়। তখন কবি সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিকের তীর্থ-ভূমিতে পরিণত হবে চুরুলিয়া। হয়তো একদিন চুরুলিয়া গ্রাম, চুরুলিয়া পোষ্ট অফিস ও চুরুলিয়া রেলওয়ে স্টেশন—সব কিছুই নজরুল ইসলামের নামে হয়ে যাবে। নজরুলের ভ্রাতুষ্পুত্ররা তাদের মনের এই উদ্দেশ্য ও কামনা হতেই প্রমীলার মৃতদেহ চুরুলিয়ায় কবর দিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এত বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তাই চুরুলিয়াতেই প্রমীলার কবর হয়েছে।

লেখকের 'নজরুল ইসলাম : স্মৃতি কথা' গ্রন্থ থেকে।

কাজী নজরুল ইসলাম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলাম—এ নাম এককালের আশ্চর্য বিস্ময়কর নাম। এ কালে সে নামের সঙ্গে আর অনেক কিছু যুক্ত হয়ে আরও শ্রদ্ধা ও বেদনামিশ্রিত বিস্ময়ের হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে রাষ্ট্র-সমাজ আজ তার শ্রদ্ধা মিশিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যে-কালের কথা আমি বলছি সে-কালের সে-বিস্ময়ের সঙ্গে বুঝি কিছুর তুলনা হয় না।

কালবৈশাখীর ঝড় আসে, কিন্তু এক একটা ঝড় আসে যার চিহ্ন পৃথিবী বহন করে শত বৎসর পর্যন্ত। আড়াইশো-তিনশো বছরের চিহ্ন আমি দেখেছি। আড়াইশো বছর আগে মাঠের মধ্যে একটা বিরাট বিশাল বটগাছ শিকড়সুদ্ধ নিয়ে এক কালবৈশাখীর ঝড়ে উল্টে উপড়ে পড়েছিল। গাছটার ডালপালা লোকে কেটে নিলে, পোড়ালে—তার চিহ্ন কেউ রাখেনি। কিন্তু যে গর্তটা হল ও মাটি থেকে শিকড় ছিঁড়ে গাছটা ওল্টানোর ফলে সেটা আয়তনে এবং গভীরতায় এমনই অসাধারণ যে, গাছটার স্থলে যে খাতের সৃষ্টি হল —সেটাকে চারিয়ে ক্ষেত করা গেল না, বাগান করা গেল না, তার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং গভীরতা নিয়ে সে হল একটা ছোট বাঁধ। পুকুরটার নাম আজ 'ঝড়ের বাঁধ'। ঝড়ের বাঁধে আজও জল থাকে, তা থেকে আজ সিচন হয়। ওর মধ্যে আড়াইশো বছর আগের ঝড়টার পাঞ্জার ছাপ আজও স্পষ্ট। এক্ষেত্রে অস্বীকৃতির কোন প্রশ্নই ওঠে না; স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির কোন প্রতীক্ষা না-করেই ঝড় আসে এবং যেখানে আসন নেবার, যেখানে পাঞ্জার ছাপ আঁকবার তা এঁকে দিয়ে যায়।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সেই কালবৈশাখীর ঝড়। শুধু সাহিত্য-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নয়, বাঙালীর সমগ্র জীবন-ক্ষেত্রে।

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর জীবনী লিখেছেন—নাম দিয়েছেন জ্যৈষ্ঠের ঝড়। ঝড় তাতে সন্দেহ নেই। বাংলার হৃদয়-ক্ষেত্র থেকে এক বিস্ময়কর আবেগ, সেদিন খাঁটি বাঙালীত্বময় প্রকাশে প্রকাশিত হয়েছিল—তিনি তাই। বাংলাদেশের নবীন প্রাণের হৃদয় থেকে অবরুদ্ধ গান সেদিন তাঁর কণ্ঠ দিয়েই বের হয়ে এসেছিল।

আমি সেকালে গ্রামবাসী। নেহাৎই গ্রাম্য জন, মাত্র একজন দেশকর্মী। সাহিত্যে পিপাসু জন মাত্র, সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বরাতী প্রীতি উপহার লিখি—এবং গোপনে—দেশকে বন্দনা করে কবিতা লিখি। পূজার সময় কবিতা রাজদ্রোহমূলক হলে হাতে লিখে পূজা-মণ্ডপের দেওয়ালে বা দরজায় আঠা দিয়ে সেঁটে দি। "দেবাসুর সংগ্রামের হয়েছে সময়"; বা "মাটির হাতে আর খেলার প্রহরণ জননী পায়ে ধরি ধ'রো না ধরো না।" এই ধরনের লেখা সেগুলি। সেই সময় কাজী সাহেবের "বিদ্রোহী" কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। সেবার বৈশাখে—(১৯২২।২৩ হবে বোধ করি) "তোরা সব জয়ধ্বনি কর" কবিতাটি প্রবাসীতে বেরিয়েছিল; পড়ে বুকের মধ্যে ঝড়ের স্পর্শ অনুভব করেছি। এই সময়ই আমাদের গ্রামে শখের মঞ্চের অভিনয় উপলক্ষে এসেছিলেন স্বর্গত নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—তাঁর কাছ থেকে কোন বই বা কোন পত্রিকায় "বিদ্রোহী" কবিতাটি পড়তে পাই। তারপর শুনি সভা ও সমিতিতে গান—শিকল-ভাঙার গান, জীবনপণের গান—রুদ্ধবক্ষ জীবনের গান। ভূমিকম্পের যে একটা গর্জন আছে, বজ্রপাতের হিংস্র-চীৎকারের মত যে হুঙ্কার আছে—তারই সুর—তারই উত্তাপে—তারই বীর্যবত্তা ছিল সে গানে।

সে কালে বাংলার যৌবনের রূপ, একটি মাত্র রূপ;—সে রূপ বিপ্লবী রূপ। সেই ১৯২২ সাল। ২৩ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত বাংলার এই যৌবন সম্পর্কে যখনই মনে মনে ধারণা করতে চেয়েছি

—তখনই মনে পড়েছে একসঙ্গে দুটি নাম—প্রথম নাম—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—এবং তাঁর ঠিক পিছনেই তাঁর ছায়ার মত দেখতে পেতাম আরও এক নামীয় জনকে—তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। আরও একজনকে মধ্যে মধ্যে মনে হতো—তিনি সাধক ও গায়ক দিলীপকুমার রায়। তবে রায় মহাশয় সরে সরে গেছেন নিজে থেকেই। কাজীসাহেবও সরে এসেছেন। ওইখানে দাঁড়িয়ে দেশের গান গাইতে গিয়ে তাঁর জীবনে খুলে গিয়েছিল দেশাতীত ও কালাতীত চিরন্তন সংস্কৃতি ও সাধনার ক্ষেত্রের বা রাজ্যের সিংহ-দ্বার। সুরের রাজ্যে এসে সুরের সুরধনীর প্রবাহে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন।

একদিন বাংলাদেশের মানুষ হঠাৎ শুনল নতুন সুর নতুন গান। "কে বিদেশী বন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজায় বনে।" পাগল হয়ে গেল, মাতাল হয়ে গেছিল এই সুরের মাদকতায় সেদিন বাংলা-দেশ। তারপরই শুনেছি "কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন"। আশ্চর্য। স্বল্প কয়েকটা বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর জীবনের মধ্যাহ্নে মধ্যগগনে বিদ্যমান—তখন কাজী-সাহেব এলেন। এলেন কালবৈশাখী বা অকাল বৈশাখীর মত।

অথবা আগ্নেয়গিরি। হঠাৎ একদিন বাংলাদেশের যুবক-জীবনে সঞ্চিত যে অগ্নিজ্বালা ও জীবন-ধাতু অবরুদ্ধ হয়ে শতাব্দী কাল ধরে টগবগ করে ফুটছিল—তা অবরুদ্ধ মুখটাকে ফাটিয়ে আকাশলোকের দিকে অগ্নিদীপ্ত ও শিখা-প্রসারিত করে দিল। কাজীসাহেবের প্রেমের গান প্রকৃতির গানেও আশ্চর্য মাদকতা। বিস্ময়কর প্যাশনে যেন আচ্ছন্ন করে নাচন জাগায় যুবক-জীবনে। আবার বাংলাদেশের মাটির বুকে তিনিই এই বিংশ শতাব্দীতে সাধক রামপ্রসাদের উত্তর-সূরী।

কাজীসাহেবের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় যৎসামান্য, অকিঞ্চিৎকর। ১৯৪০ সালে ঠিক পূজার পর তিনি হঠাৎ একদিন রাত্রে

হাসির গানের গায়ক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকারকে সঙ্গে করে আমার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার আগে কাজী-সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্যই হয়নি। তিনি আমাদের ওখানে স্থানীয় একটি দেবস্থলে বাতের ওষুধের জন্য গিয়েছিলেন (তাঁর স্ত্রীর জন্য)। হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম তাঁরা আসছেন—একদিন আমার বাড়িতে থাকবেন। সেদিন দুর্ভাগ্যক্রমে আমার একটি শিশুপুত্র মারা গিয়েছিল দুপুরবেলায়। রাত্রে এলেন। এবং একান্ত অপ্রতিভ বিষণ্ণতার মধ্যেই আমার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। পরদিন কাজীসাহেব আমাদের গ্রামের "ফুল্লরা দেবী"র (মহাপীঠ-রূপে খ্যাত) স্থানে গেলেন। এবং মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরের উপর পদ্মাসন হয়ে বসে প্রাণায়াম সহযোগে যে জপ করেছিলেন তা দেখে একথা বলব যে এই ব্যক্তি এক আশ্চর্য-চরিত্র ব্যক্তি ; তাঁর অন্তরের যে পিপাসা, যে-পিপাসা যৌবন-পিপাসায় মাতাল করা গজল গানে ব্যক্ত হয়েছে—সেই পিপাসাই অন্তরের পিপাসা হয়ে ব্যক্ত হয়েছে এই শ্যামাসঙ্গীতে এবং সাধারণ জনের দৃষ্টির অগোচর সাধনায়। যাঁরা তাঁর অতি সন্নিকটের মানুষ—তাঁরা এই দিকটিকে আড়াল দিয়ে এড়িয়ে চলেন—এই পরমাত্মিক গভীর হৃদয়ের তৃষ্ণা তাঁদের নেই, তাই এদিকটার কথা অল্পই প্রকাশিত হয়েছে। এদিকটাতে কেউ যদি তাঁর সঙ্গী সাথী থাকতেন তবে দেশপ্রেমিক বিদ্রোহী নজরুল, সাম্যবাদী নজরুল, প্রেমের কবি নজরুল—এই সব রূপের নজরুলের সঙ্গে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার তৃষিত নজরুলের বিচিত্র রূপটিও প্রকাশিত হতো। তা হয়নি।

উপমার ঝড়ের চেয়েও আগ্নেয়গিরির সঙ্গেই যেন নজরুল ইসলামের বেশী মিল আছে। সেই জ্যামিতিক ত্রিভুজের মিলের মত মিলে যায়। কবির জীবনের বহ্নি-তপস্যা আগ্নেয়গিরির মতই একদা বহ্নিমান হয়ে উঠল ; নিজেকে নিঃশব্দে রিক্ত করে জীবনের সব কিছুকে উদগীরণ করে ঢেলে দিল মানুষের বুকে বুকে। তারপর

একদা স্তব্ধ হয়ে গেল। নিঃশেষিত বহ্নি নিঃশেষিত জীবন-ধাতু স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির মতই তিনি নির্বাক স্তব্ধ হয়ে একটি বিষণ্ণ অথচ সাধ-কোচিত মহিমায় আমাদের মধ্যে বিরাজিত রয়েছেন। নজরুল ইসলামের এই স্তব্ধতার মধ্যে একটি প্রসন্নতা আছে, সেটি নির্বোধের হতাশাজনক ভঙ্গি নয়—এটা যিনি জানেন তিনিই অনুভব করবেন।

এই জীবনকে বলা উচিত মহাজীবন। কারণ এর মধ্যে লুকানো রয়েছে একটি সনাতন তপস্যা। সে তপস্যা কবিযশ নয়, সে তপস্যা যৌবন রূপ রস সঙ্গীত সমৃদ্ধ কয়েকটা দিন-রাত্রির খেলা নয়, সে তপস্যা ঈশ্বরকে জানার তপস্যা। সৃষ্টির আদিম প্রশ্নের উত্তরের যে তপস্যা—এ তপস্যা তাই।